উপন্যাস

সরাইখানা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
2021

সূচিপত্র

১. পথে নানা রকম বিপদের আশঙ্কা........2
২. ছেলেকে বুকে জড়িয়ে........18
৩. রাজবৈদ্য বাসবদত্তের গৃহ........35
৪. সুরপতির বৈচিত্র্যহীন কারাবাস........51
৫. তিথির পর তিথি........65
৬. পান্থশালায় বিশ্রাম........106
৭. ধ্রুবকুমারকে কোলে তুলে........111
৮. প্রশ্নের উত্তর........120
৯. সুভদ্রার ‘নাথ’ ডাক শুনে........133

১. পথে নানা রকম বিপদের আশঙ্কা

পথে নানা রকম বিপদের আশঙ্কা আছে বলে সুরপতি একটি বড় বণিকদলের সঙ্গ নিয়েছিল। সুরপতির সঙ্গে তার তরুণী পত্নী সুভদ্রা আর চার বছরের শিশুপুত্র ধ্রুবকুমার।

অনেক দস্যুও বণিকের ছদ্মবেশে পথে পথে ঘোরে, সেই জন্য ভয় ছিল সুরপতির। কিন্তু এই দলটি সম্পর্কে সে-সন্দেহের অবকাশ নেই। এই দলে রয়েছে প্রায় আঠাশ-তিরিশ জন লোক এবং অনেকগুলি ঘোড়া ও খচ্চরের পিঠ-বোঝাই মালপত্র। দলটির সামনে ও পিছনে রয়েছে অস্ত্রধারী প্রহরী। অনেক অনুরোধ করে সুরপতি এই দলের মধ্যে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। অবশ্য প্রহরীদের খরচ বাবদ তাকে দিতে হয়েছে দশটি সিক্কা টাকা।

সুরপতির সঙ্গে ধন-সম্পদ বিশেষ কিছুই নেই। সে বিষণ্ণ মনে দেশ ত্যাগ করছে। মাত্র কয়েক সপ্তাহের ভীষণ কালাজ্বরে তার পরিবারের আর সকলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তার বৃদ্ধা মা, বড় ভাই তার স্ত্রী-পুত্রাদি, সুরপতির চেয়েও বয়সে ছোট এক কাকা পর পর ওই অসুখে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল এক মাসের মধ্যে। সুরপতির শোক করারও সময় পায়নি।

বিপদ শুধু এক দিক দিয়ে আসে না। এই সময়েই আবার বাজারে আগুন লাগে। দু’পুরুষ ধরে সুরপতিদের অন্নের সংস্থান হত যে বস্ত্রের দোকানটি থেকে, সেটিও পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুন লাগার খবর পেয়ে সুরপতি বাড়িতে তিনটি মুমূর্ষ আত্মীয়কে রেখে ছুটে গিয়েছিল, কিন্তু তখন বন্দরের সারি সারি দোকান দাউ দাউ করে জ্বলছে। নিয়তিতে টানা পতঙ্গের মতো সুরপতি ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েছিল, প্রতিবেশিরা তাকে জোর করে ধরে রাখে। তখন মাথা চাপড়ে হায় হায় করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। সকলেই বলাবলি করছিল, সপ্তগ্রাম বন্দরে অলক্ষ্মীর দৃষ্টি লেগেছে।

ভগ্নহৃদয় সুরপতি তারপর বিষয় সম্পত্তির যেটুকু অবশিষ্ট ছিল সব বিক্রি করে দেশত্যাগ করেছে। বিষয়-সম্পত্তির দামও বিশেষ কিছু পায়নি, কারণ দেশজোড়া মন্দা চলছে, খরিদ্দার কেউ নেই। ভাগ্যান্বেষণে সুরপতি চলেছে দেশান্তরে।

কিন্তু সুরপতির বড় সম্পদ তার স্ত্রী। এমন রূপসী রমণী সচরাচর চোখে পড়ে না। সুভদ্রা বেশ দীর্ঘাঙ্গী, তার মাথার চুল পিঠ ছাপিয়ে নেমে আসে, বড় বড় অক্ষিপল্লব, অতি কোমল পেলব মুখ। সমস্ত শরীরখানাই যেন লাবণ্যমাখা। রাজেন্দ্রাণী হলেই তাকে মানাত, কিন্তু সে বাঁধা পড়েছে সুরপতির মতো এক ভাগ্যহীনের সঙ্গে।

সুভদ্রা শুধু রূপসীই নয়, তার মনটিও অতি কোমল। পৃথিবীতে যে কত পাপ, কত অন্যায় আছে, সে যেন তার খবরই রাখে না। সে সব কিছুই সুন্দর দেখে। সুভদ্রার জন্ম অতি গরিব বাড়িতে, অথচ সে অর্থসম্পদের কোনও মূল্যই বোঝেনি এ পর্যন্ত। সুরপতির যখন অবস্থা সচ্ছল ছিল, তখন সুভদ্রা দু'হাতে বিলিয়েছে। কোনও দীন-দুঃখী ফেরেনি তাদের বাড়ি থেকে। আবার এখন যে সুরপতি এমন দরিদ্র হয়ে গেছে, তাতেও তার কোনও রকম মালিন্য নেই। সব কিছুই সে হাসিমুখে সহ্য করতে পারে। ছেলেটিও হয়েছে ঠিক মায়ের মতো।

সুরপতির ভয় তার স্ত্রীকে নিয়ে। সুন্দরী রমণীকে নিয়ে পথচলার বিপদ অনেক। তাছাড়া সুরপতির আর একটা দুর্বলতা আছে। স্ত্রীকে সে এতই ভালবাসে যে, অপর কোনও পুরুষ তার স্ত্রীর দিকে একটু তাকালেই সে সহ্য করতে পারে না। ক্রোধে তার শরীর জ্বলে যায়। যদিও সুভদ্রা সবসময় অবগুণ্ঠনে তার মুখ ঢেকে রাখে, তবু তারও অনিন্দ্যকান্তির দিকে মানুষের চোখ যাবেই।

বণিকদলের মধ্যে একটি তরুণ সুভদ্রার পুত্রকে আদর করার ছলে প্রায়ই সুভদ্রার কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করে। দুদিন ধরেই সুরপতি লক্ষ্য করছে। যুবকটিকে তার পছন্দ হয় না। যুবকটির নাম ধনরাজ। সে খুব সুপুরুষ না হলেও স্বভাবটি অতি উচ্ছল। সে বেশি কথা বলে, বেশি হাসে। তার চোখের তারা দুটি চঞ্চল, কারুর দিকে দৃষ্টি স্থির রাখতে পারে না। এই প্রকারের মানুষ সাধারণত বিশ্বাসযোগ্য হয় না।

তবে একটি আশ্বাসের কথা এই যে, বণিকদলের দলপতি পূর্ণানন্দর ওপর ভরসা করা যায়। বিশাল তার চেহারা, মেজাজটিও খুব কড়া, কিন্তু মানুষটি ধার্মিক প্রকৃতির, দলের

মধ্যে তিনি কঠোর শাসনের প্রবর্তন করে রেখেছেন। সুরপতির বিশ্বাস আছে যে, ধনরাজ যদি বেশি বাড়াবাড়ি করে তাহলে পূর্ণানন্দের কাছে নালিশ করলে সুবিচার পাওয়া যাবে।

সারা দিন ধরে পথ চলা, তারপর সন্ধ্যার পর বিশ্রাম।

এখন গ্রীষ্মকাল, তাই রাতের বাইরেই শুয়ে থাকা যায়। প্রান্তরের মধ্যে সকলেই কাছাকাছি শুয়ে থাকে, রক্ষীরা পালা করে প্রহরা দেয়। চারদিকে আগুন জ্বালা থাকে।

বণিকরা যাবে অনেক দূর। এক মাস, দেড় মাসের পথ পায়ে হেঁটে তারা চলে যায় এ রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে। আবার কয়েক মাস পর ফেরে। সুরপতিরা কোথায় যাবে তার ঠিক নেই। এর মধ্যেই তারা পার হয়ে এসেছে কয়েকটি নগর, কিন্তু সব জায়গাতেই দেখেছে কালা জ্বরের উপদ্রব। মানুষের মধ্যে হাহাকার। বঙ্গদেশে এখন সম্পূর্ণ অরাজকতা চলছে, নবাবি শাসন অতি শিথিল, মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারেরা, যাদের অর্থ সম্পদ এসেছে ডাকাতি থেকে এর মধ্যে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে সাগরপার থেকে আসা শ্বেতাঙ্গ টুপিওয়ালারা, যারা নিজেদের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু বোঝে না। তার ওপর দুঃস্বপ্নের মতো যখন-তখন আসে বর্গির হাঙ্গামা, হ্রস্বতায় ঘোড়ায় চেপে দুর্ধর্ষ মারাঠারা প্রবল ঝড়ের মতো এসে এক-একটা জনপদ লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যায়। বঙ্গের কোথাও এখন আর শান্তি নেই, অনেকেই এ রাজ্য ছেড়ে পালাচ্ছে।

সুরপতি এমন কোনও নগরে বসতি নিতে চায়, যেখানে আছে সুখ। আছে সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। যেখানে বিদেশি নতুন মানুষও পেতে পারে কোনও রকম জীবিকা অর্জনের সুযোগ। জানে না, সে-রকম নগর কোনও দেশে আছে কি না!

এমন দিনের পর দিন পায়ে হাঁটার অভ্যেস নেই সুরপতির। তবু সে পুরুষ মানুষ। সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমার তো কখনওই হাঁটেনি। ধ্রুবকুমারকে পালা করে কোলে নিতে হয়। অবশ্য একটা সুবিধে এই, এই সার্থবাহের সকলেই ধ্রুবকুমারকে খুব ভালবেসে ফেলেছে। সকলেই তাকে নিয়ে কৌতুক করে, স্বেচ্ছায় তাকে কোলে নিয়ে যায়। সুভদ্রার কোমল

পা দু'খানি নিশ্চয়ই এতখানি পথ চলায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে, কিন্তু একটি বারও সেটুশব্দটি করেনা। বরং রাত্রিবেলা সে সুরপতির পায়ে তেল মালিশ করে দেয়।

একবারই মাত্র, কাল দুপুরে সুভদ্রা উঃ শব্দ করে বসে পড়েছিল পথের মাঝখানে। তার পায়ে একটা কাঁটা ফুটেছে। কী হয়েছে, কী হয়েছে বলে ধনরাজই আগে ছুটে গিয়েছিল। সুরপতি রুক্ষভাবে বলেছিল, আপনি সরুন! আমি দেখছি!

সুভদ্রা কিছুতেই পা দেখাবে না। স্বামীকে তার পা ছুঁতেও দেবে না নিশ্চয়ই সে অতিরিক্ত ব্যথা পেয়েছে, কারণ চোখে টল টল করছে জল। সুরপতি জেদ করতে লাগল কাটাটা দেখবার জন্য। সুভদ্রা পা ঢেকে রেখেছে। শেষ পর্যন্ত ধনরাজই বাতি জ্বেলে তাতে একটা বড় আকারের চাবি নিয়ে গরম করে সুরপতিকে বলল, আপনি এটা ঠেসে ধরতে বলুন ক্ষতস্থানে।

সেই ভাবেই কাটাটা উঠল বটে কিন্তু সুরপতি খুব একটা খুশি হল না তাতে। সে ধনরাজের সাহায্য নিতে চায়নি। সেই সুযোগে পাষণ্ডটা সুভদ্রার অনেক কাছাকাছি এসেছিল এবং তার মুখ দেখার চেষ্টা করেছিল।

এই এক জ্বালা। মুখে কিছু বলা যায় না, সুরপতি ধনরাজকে কিছুতেই বলতে পাবে না, তুমি আমার পত্নীর দিকে তাকাচ্ছ কেন হে? সেটা হাস্যকর শোনাবে। অথচ ভেতবে ধিকি ধিকি করে জ্বলে রাগ। ছোঁকরাটিও অতি নির্লজ্জ, সুরপতি আকারে-ইঙ্গিতে তার অসূয়ার কথা জানায়, তবু ধনরাজ দূরে সরে যায় না। বরং বার বার গায়ে পড়ে উপকার করতে আসে।

আজ সকাল থেকে চলার গতি বৃদ্ধি করতে হয়েছে পূর্ণানন্দের আদেশে। আকাশে মেঘ জমেছে। দু'এক দিনের মধ্যেই বৃষ্টি নামতে পারে। বৃষ্টির সময় পথ চলা দায় হবে। রাত্রিবেলা আশ্রয় নিতে হবে কোনও চটিতে। তার খরচ আছে। তাছাড়া এক চটিতে এতগুলি মানুষের সংস্থান হবে কি না তা-ও একটা কথা।

দ্রুত পথ চলার আরও একটি কারণ আছে। এখানেই কুখ্যাত ডাকাত সর্দার বুধনাথের দলের খুব উপবছিল এক সময়। হিংস্র পশুর চেয়েও নৃশংস এই বুধনাথ। যদিও শোনা গেছে যে, টুপিওয়ালা সাদা চামড়ার সাহেবদের সঙ্গে নাকি বুধনাথের দলের খুব একচোট লড়াইহয়ে গেছে কিছুদিন আগে, তাতে বুধনাথের দল পর্যদস্ত হয়ে গেছে তবু তার চ্যালা-চামুণ্ডারা কেউ থাকতে পারে। দিনের বেলাতেই জায়গাটা পার হয়ে যাওয়া ভাল।

এর মধ্যেই মাঝে মাঝে দু'একটি যাত্রীদলের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তার মধ্যে একটি দল যে দস্যুদের, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তাদের ধরন-ধারণ, তাদের চোখের চাহনি সবই বক্র। দলের মধ্যে সকলেই সমর্থ জোয়ান, একটিও শিশু বা বৃদ্ধ নেই, সেটাও স্বাভাবিক মনে হয় না। মাঝে মাঝে দু'একটি লোক হঠাৎ পথের ধার থেকে উঠে এসে এই যাত্রীদলের সঙ্গে যোগ দিতে চায়। এগুলিও সন্দেহজনক। এরা সাধারণতদস্যুদের গুপ্তচরহয়। পূর্ণানন্দকারুকেই স্থান দেননি। তিনি মানুষ চেনেন। অন্য যে দলটিকে ডাকাত বলে সন্দেহ করা হয়েছিল, তাদের সম্পর্কে তিনিই সকলকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। সেই দলটির মতলব নিশ্চিত ভাল ছিল না। কিন্তু এদের এত বড় দল ও সশস্ত্র রক্ষী দেখে তারা নিরীহ সেজে পাশ কাটিয়ে গেছে।

দুপুরের মধ্যে ওরা বল্লারপুরের সেই কুখ্যাত মোড়টি পার হয়ে গেল। জায়গাটা খাঁ-খাঁ করছে, এ-দিক ওদিক ছড়ানো রয়েছে কিছু শুকনো হাড়। ওগুলি ঘোড়ার হাড় বলেই মনে হয়। তাহলে এখানে নিশ্চিত কোনও যুদ্ধ হয়েছিল। টুপিওয়ালা সাদা চামড়ারা কোনও লড়াইতে চট করেহারেনা। ওরাও দল বেঁধে ব্যবসা করতে আসে, কিন্তু প্রত্যেকের সঙ্গেই আগ্নেয়াস্ত্র থাকে। টুপিওয়ালাদের দেখে সাধারণ মানুষরা ভয় পায় না, যেমন ভয় পায় নবাবের সৈন্যদের দেখে।

বল্লারপুর ছোট্ট একটি জনপদ। একটি চটি ও কিছু দোকান আছে। এখানকার মানুষজনকে দেখলে মনে হয়, তাদের মধ্যে সেরকম কোনও আতঙ্ক নেই। পথশ্রমে ক্লান্ত সুরপতির একবার মনে হল, আর বেশি দূর এগিয়ে কাজ নেই। এখানেই বসতি নিলে হয়। কাছেই একটি বেশ বড় আকারের নদী আছে। নদী-প্রান্তবর্তী জনপদের সমৃদ্ধি ক্রমেই বাড়ে।

পরামর্শের জন্য সুরপতি প্রস্তাবটা উত্থাপন করল পূর্ণানন্দের কাছে। পূর্ণানন্দ এককথায় উড়িয়ে দিলেন। তিনি বহুদর্শী লোক, জীবনে বহুনগর জনপদ দেখেছেন।

তিনি বললেন, সুরপতি এখানে গৃহনির্মাণ করে থাকতে পারে বটে, কিন্তু এখানে জীবিকার্জনের কোনও আশা নাই। এত ছোট জায়গায় বাইরের কোনও নতুন লোক এসে সুবিধে করতে পারে না। প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়লে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা খড়্গহস্ত হবে। তারা নবাগতকে ছলে-বলে-কৌশলে দমিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। আবার হয়তো সুরপতির বিপণিতে আগুন লাগবে। নতুন ভাবে জীবন শুরু করতে হয় কোনও বড় জায়গায়। ছোট জায়গায় সংকীর্ণতা বেশি। তাছাড়া এতটুকু জায়গায় তিনটি কালী মন্দির, অর্থাৎ এখানকার লোকেরা ঘোর শাক্ত, সুরপতির মতো বৈষ্ণব এখানে সহজে মানিয়ে নিতে পারবে না।

সুরপতি পূর্ণানন্দের কথাগুলো চিতা করে দেখল। এই পরামর্শ তার যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হল। ভাল করে ভেবেচিন্তেই স্থান নির্বাচন করতে হবে। বড় জায়গাতেই নতুন লোকের পক্ষে প্রতিষ্ঠা পাওয়া সুবিধে। আর কিছুদূর গেলেই অন্য রাজ্য, সেখানে বৃহৎ কোনও নগর থাকতে পারে।

বল্লারপুরে আহারাদি সেরে এবং কিছু রসদ সংগ্রহ করে দলটি আবার বেরিয়ে পড়েছিল। আবার পথ চলা।

এখন সন্ধে হয়ে এসেছে। এবার কোথাও রাত্রির মতো থাকতে হবে। কাছাকাছি কোনও সুবিধাজনক স্থান পাওয়া যাচ্ছে না। আগাগোড়া রুক্ষ মাঠ। একটা কোনও জলাশয় থাকা দরকার। এত লোকের হাত- মুখ প্রক্ষালনের জন্য কম জল লাগে না।

ধনরাজ এসে সুরপতির পাশাপাশি হাঁটছে। অদুরে ছেলেকে কোলে নিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে সুভদ্রা। সুভদ্রা হাঁটছে সামান্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। কিন্তু সেদিকে সুরপতির নজর পড়লেই সে আবার সামলে নিচ্ছে নিজেকে। সে কিছুতেই স্বীকার করবে না যে, তার

পায়ে কাঁটা ফোঁটার ব্যথা আছে। একটু আগে সুরপতি ছেলেকে নিজের কাছে নিতে চেয়েছিল, সুভদ্রা রাজি হয়নি। সুভদ্রা একবারও ক্লান্তির কোনও চিহ্ন দেখায় না।

ধনরাজ সুরপতিকে বলল, আপনি নতুন জায়গায় বসতি নিতে চাইছেন, আপনাকে আমি একটি উপযুক্ত জায়গার সন্ধান দিতে পারি।

সুরপতি বলল, কোথায়?

ধনরাজ অতি উৎসাহের সঙ্গে বলল, আপনি দারুকেশ্বর চলুন। সেখানকার জল অতি মিষ্টি, দূর দূর থেকে লোকে দারুকেশরের জল পান করতে আসে। সেখানে জমি অতি উর্বরা, ফসলে কখনও কীট লাগে না। মানুষজন অতি শিষ্ট। দারুকেশ্বরে বিখ্যাত পণ্ডিতের টোল আছে, আপনার পুত্রটি সেখানে বিদ্যাশিক্ষা করতে পারবে।

দারুকেশ্বরে বাণিজ্যের হাল কীরকম?

দারুকেশ্বরে মস্ত বড় হাট বসে। গঞ্জের হাট, নৌকোয় করে সব বণিক আসে অন্য রাজ্য থেকে। দারুকেশ্বরের রেশমি কাপড়ের খুব সুনাম আছে। ইংরাজ বণিকরাও ওই কাপড় বেশি দাম দিয়ে কেনে।

কাপড়ের কথা শুনে সুরপতি একটু বেশি আগ্রহী হল। কয়েক পুরুষ ধরে তাদের কাপড়েরই ব্যবসা। সে নিজেও ওইটাই ভাল বোঝে।

সে জিজ্ঞেস করল, ওখানকার তাঁতিরা কি দাদন নিয়ে খাটে? নাকি নিজেদেরই মূলধন?

অনেক তাতি আছে, কে কীরকম ভাবে খাটে, তা আমি ঠিক বলতে পারি না।

কত দূর দারুকেশর?

আর দু'দিনের মাত্র পথ। আমার নিজের বাড়ি সেখানে। আপনি যদি গৃহ নির্মাণ করতে চান, আমি নিজে সব ব্যবস্থা করে দেব।

সুরপতি একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল। দারুকেশ্বর জায়গাটার কথা শুনে তার বেশ পছন্দই হয়েগিয়েছিল। কিন্তু সেখানে এই যুবকের বাড়ি। সুরপতির আগ্রহ কমে গেল। সাহায্য করার ছুতোয় ধনরাজ সেখানে সুরপতির বাড়িতে প্রায়ই আনাগেনা করবে, আর সুভদ্রার দিকে লোভীর চোখে তাকাবে। তাঁতীদের দাদন দেবার জন্য সুরপতিকে মাঝে মাঝে যেতে হবে গ্রামান্তরে, তখন সুভদ্রা বাড়িতে একা থাকবে। সেই সুযোগ নিয়ে আসবে এই রূপচোর।

সুরপতি উদাস ভাবে বলল, দেখি।

ধনরাজ আরও সবিস্তারে দারুকেশরের গুণপনা বর্ণনা করতে লাগল। এমন জায়গা যেন দুনিয়ায় নেই। সুরপতিকে সে সেখানে নিয়ে গিয়ে বসাবেই। সুরপতি অবশ্য ইতিমধ্যেই মনেমনে ঠিক করে নিয়েছে যে, আর যেখানেই যাক দারুকেশ্বরে সে কখনওই যাবে না।

ধ্রুবকুমার তার মায়ের কোল থেকে নেমে পড়েছে। এবার ধনরাজ দৌড়ে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিল। তারপর খেলাচ্ছলে তাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিল আবার। ধ্রুবকুমার খল খল করে হেসে উঠল। এর মধ্যেই ধ্রুবকুমারের সঙ্গে ধনরাজের বেশভাব জমে গেছে। সে ধনরাজের কটিবন্ধে ঝোলানো তলোয়ারটা নিজের হাতে নিতে চায়।

সন্ধে গাঢ় হয়ে এসেছে। কাছেই একটি অরণ্য। সাধারণত অরণ্যের মধ্যে এরা রাত্রিবাস করতে চায় না। কিন্তু এই অরণ্যটি তেমন ঘন নয়। দূরে দূরে গাছ, মাঝখানে পরিষ্কার তকতকেভূমি। এইসব জঙ্গলে সাধারণত হিংস্র প্রাণী থাকেনা। তার চেয়েও বড় কথা, এই জঙ্গলের মধ্যে একটি স্বচ্ছ জলের ঝরনা আছে। এই জল পান করা যায় নিশ্চিন্তে। সব দেখে শুনে পূর্ণানন্দ এখানেই রাত্রিবাসের নির্দেশ দিলেন।

সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারকে নিয়ে সুরপতি একটা বড় পিপুলগাছের নিচে আশ্রয় নিল। কাঁধের বোঝ নামিয়ে রাখল এক পাশে। ঘোড়াও খচ্চরের পিঠে বণিকদের যে মালপত্র

রয়েছে তার মধ্যেও সুরপতি নিজেদের দুটি পুটলি চাপিয়ে দিয়েছে। এখন সেগুলি নিয়ে এল।

দিনেরবেলা গুরুভোজন হয়েছে, রাত্রে বিশেষ কিছু না খেলেও চলে। সঙ্গে কিছু ক্ষীরের লাড়ু আছে। তাছাড়া এক্ষুনি এক জায়গায় বেশ বড় করে আগুন জ্বালানো হবে, সেখান থেকে যে-যার ইচ্ছে মতো অন্নব্যঞ্জন তৈরি করে নিতে পারে। দলের মধ্যে আর কোনও নারীও নেই, শিশুও নেই। বণিকরা এই সময় রোজই ধ্রুবকুমারকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুব আদর-যত্ন করে। বোধহয় তাদেরও বাড়িতে ছেড়ে আসা শিশুপুত্রের কথা মনে পড়ে।

সুভদ্রা ঘোমটাটা এই সময় একটু তুলল। পরিশ্রমে তার ফরসা মুখখানি এখন রক্তাভ। তবু সে সুরপতির দিকে চেয়ে হাসল।

সুরপতি বলল, আজ সপ্তম দিন পার হল। আর তো হাঁটা যায় না। এবার সামনে যেনগরী পাব, সেখানেই থেকে যাব।

সুভদ্রা বলল, আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে।

সুরপতি ক্লান্তভাবে হেসে বলল, না। আমার কষ্টের জন্য নয়, আমি ভাবছি তোমাদের কথা। তোমার পায়ের সেই ক্ষত স্থানটা দেখি, যেখানে সেই কাটা ফুটেছিল?

সুভদ্রা তাড়াতাড়ি পা ঢেকে বলল, সেখানে আর ব্যথা বিষ নেই।

তবু আমি দেখব।

দেখার কিছু নেই। আপনার মুখ ধোওয়ার জন্য জল এনে দেব?

সে সব পরে হবে। আগে তোমার পা দেখাও আমাকে। এখানে কাছাকাছি কেউ নেই, এখানেও কি তোমার লজ্জা?

সুভদ্রা কিছুতেই দেখাতে চায় না, কিন্তু সুরপতি দারুণ জোরজুরি করতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত সুভদ্রা তার পায়ের পাতা স্বামীকে দেখাতে বাধ্য হল। তা-ও দূর থেকে।

সে-জায়গাটা দেখে শিউরে উঠল সুরপতি। পা-টা একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে। খানিকটা মাংস খুবলে গেছে। এই রকম পা নিয়ে হেঁটে আসছে সুভদ্রা, অথচ একবারও মুখ ফুটে কিছু বলবে না!

সুরপতি বলল, তুমি কী সুভদ্রা? তুমি কি মানুষ?

সুভদ্রা মৃদু গলায় বল, আপনি বেশি চিন্তিত হচ্ছেন। আমার তেমন ব্যথা বোধ হয় না।

সুরপতি চিন্তিত হয়ে পড়ল। বণিকদলের মধ্যে বৈদ্য কেউ নেই। এ-রকম অবস্থা নিয়ে সুভদ্রার এক পা-ও চলা উচিত নয়। অথচ এই জঙ্গলে তারা একা একা থাকবেই-বা কী করে? থেকেও লাভ নেই, কোনও জনপদে নিয়ে গিয়ে সুভদ্রার চিকিৎসা করানোর দরকার।

কাল যে করেই হোক সুভদ্রাকে একটা অশ্বপৃষ্ঠে চাপাতে হবে। যাতে যত অর্থব্যয় হয় হোক। সুভদ্রা অশ্বপৃষ্ঠে উঠতে চাইবে না, দারুণ আপত্তি করবে–সুরপতি জানে। কিন্তু দরকার হলে তাকে জোর করেও তুলে দিতে হবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুরপতি বলল, সুভদ্রা, আমারই ভাগ্যদোষে তুমি আর ধ্রুবকুমার এত কষ্ট পাচ্ছ। হা নিয়তি, তুমি আমাদের আর কোথায় নিয়ে যাবে?

সুভদ্রা ব্যাকুল হয়ে বলল, ওকথা বলবেন না, ওকথা বলবেন না! আমাদের তো কোনও কষ্ট নেই। বরং কী সুন্দর এই পদযাত্রা! কত নতুন নতুন দেশ দেখছি! সারা জীবনে এক জায়গায় থাকা তো কূপের ব্যাঙের মতো, তার চেয়ে কত সুন্দর এই জীবন!

সুরপতি বলল, তুমি জানো না সুভদ্রা, তোমার গায়ে যদি একটি আঁচড় লাগে, তবে তা আমারও বুকে বাজে। তোমার পায়ের ওই অবস্থা, অথচ আমি তা জানতেই পারিনি।

আবার আমার চিন্তা হচ্ছে ধ্রুবকুমারের জন্য। ওইটুকু শিশু, তার কি দিনের পর দিন এই ধকল সহ্য হয়! এই রকম উন্মুক্ত আকাশের নিচে ঘুমোনো! যদি তার কোনও রকম গুরুতব পীড়া হয়। সে যে আমার চোখের মণি!

সুভদ্রা স্বামীর পায়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, দেখবেন আব দু'এক দিনের মধ্যেই নিশ্চয়ই আমরা কোনও পছন্দ মতো স্থান পৌঁছে যাব।

তাই যেন হয়।

সুরপতির মনে পড়ল, আসার পথে একটু আগেই সে কয়েকটা জবাফুলের গাছ দেখেছিল। জবাগাছের পাতার রসে ক্ষতস্থানের ব্যথা কমে।

সে লাফিয়ে উঠে বলল, রও, আমি আসছি!

পরিষ্কার জ্যোৎস্না উঠেছে। অরণ্যটিকে এখন মায়াময় মনে হয়। মানুষের কলগুঞ্জন আর ভারবাহী পশুগুলির জোরালো নিশ্বাসের শব্দ মিলে একটা ঐকতান তৈরি হয়েছে। এ পর্যন্ত কোনও হিংস্র জন্তুর অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়নি। ভয়ের কিছু নেই।

চাঁদের আলোয় জবাগাছগুলি খুঁজে পেতে কোনও অসুবিধে হল না। বেশ কয়েকটি পাতা ছিঁড়ে হাতের তালুতে পিষে রস করতে করতে সুরপতি আবার ফিরে আসতে লাগল।

পিপুলগাছটির কাছাকাছি এসে দেখল ধনরাজ এগিয়ে যাচ্ছে সুভদ্রার দিকে। সুভদ্রাকে একা পেয়েছে বলেই ওই তস্করটা ওই দিকে ঝুঁকেছে। ক্রোধে সুরপতির আপাদমস্তক জ্বলে গেল। কাল প্রথমেই যে নগর পাবে, সেখানেই সে এদের সঙ্গ পরিত্যাগ করবে। ধনরাজকে সে আর সহ্য করতে পারছে না।

ধনরাজের কোলে শিশু ধ্রুবকুমার। সুরপতিকে দেখে সে বলল, ঘুমিয়ে পড়েছে এরই মধ্যে। আমাদের কাছেও পেট ভরে খেয়ে নিয়েছে, সে-জন্য চিন্তা করবেন না।

ধনরাজ ধ্রুবকুমারকে সুরপতির কাছে না দিয়ে নামিয়ে দিল সুভদ্রার কোলে। সুভদ্রা ইতিমধ্যে ঘোমটা দিতে ভুলে গেছে। চাঁদের আলোয় মুখখানি এখন প্রস্ফুটিত কমলের মতো দেখায়। সেই মুখের দিকে ধনরাজ সতৃষ্ণ ভাবে তাকিয়ে রইল কয়েক পলক। তারপর আর কোনও কথা না বলে চলে গেল।

ধ্রুবকুমারকে কোলে নামিয়ে দেওয়ার ছলে পাপিষ্ঠটা নিশ্চয়ই সুভদ্রাকে ছুঁয়েছে। রাগে সুরপতি ফুঁসতে লাগল। সে এমনিতে শান্ত নিরীহ ধরনের মানুষ, লোকের সঙ্গে কলহ করতে তার প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু এখন ইচ্ছে হল, ছুটে গিয়ে ধনরাজের টুঁটি চেপে ধরে।

সুরপতি অতি কষ্টে রাগ দমন করল। তারপর মাটিতে বসে সুভদ্রার সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করে, প্রায় বলপ্রয়োগ করেই তার পায়ে থেঁতো করে লাগিয়ে দিল সেই জবাপাতা। তারপর একটা পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড নিয়ে বেঁধে দিল সেই পায়ে।

সুভদ্রার চোখে টল টল করছে জল। তার নির্মল মুখখানিতে ব্যথার চিহ্নমাত্র নেই। বরং চিকচিক করছে সুখ। ওই অশ্রুও সুখের।

ধ্রুবকুমারকে ভাল করে শুইয়ে দিয়ে ওরা স্বামী-স্ত্রীতে খুব সংক্ষেপে আহার করে নিল। চিড়ে, ক্ষীর এবং কলা তাদের সঙ্গেই থাকে। তা দিয়ে বেশ ভালভাবেই ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। খাওয়া-দাওয়ার পর ওরা মুখোমুখি বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর নিজেরাও শুয়ে পড়ল পুত্রকে মাঝখানে রেখে। অদূরে যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, তার আভা এসে পড়েছে ওদের মুখে। গাছের ঘন ডালপালার ফাঁকে একটু একটু আকাশ দেখা যায় মাথার ওপরে। মেঘ সরে গিয়ে জ্যোৎস্না উঠেছে বলে সবাই নিশ্চিন্ত।

খানিকক্ষণ দু'জনে মৃদু গলায় কথা বলে তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। স্বামী ও স্ত্রী– দু'জনেরই একটা করে হাত মধ্যবর্তী সন্তানের গায়ে। দুদিক থেকে তারা ধ্রুবকুমারকে আগলে রেখেছে। মেঘভাঙা চন্দ্রালোক এসে পড়েছে তাদের মুখে।

সুরপতির ঘুম ভেঙে গেল কিছু একটা বিশ্রী শব্দে। ভারবাহী পশুগুলি হঠাৎ চ্যাঁচাতে শুরু করেছে। সে কনুইতে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দেখল, কারা যেন ঘোড়া আর খচ্চরগুলোর দড়ি খুলে দিয়ে দম্ দম্ করে তাদের লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে। সেগুলো দৌড়ে পালাচ্ছে এ-দিক ও-দিক। তার পরই বণিকদের মধ্যে আর্তনাদ পড়ে গেল।

সত্যি যে ডাকাত এসেছে তা বুঝতে একটুখানি সময় লাগল সুরপতির। কিন্তু অস্ত্রের ঝন ঝন আর মৃত্যুকাতর চিৎকার শুনে ঘোর ভাঙতে দেরি হল না। সে জায়গা বেছে নিয়েছিল মূল বণিকদলের থেকে একটু দূরে। সে দেখল, প্রায় তিরিশ জন দস্যু সব দিক থেকে তাদের ঘিরে ধরেছে। প্রহরীদের সঙ্গে যুদ্ধ চলছে তাদের, কিন্তু প্রহরীরা এক এক করে প্রাণ দিতে লাগল, বণিকরা চিৎকার করতে করতে পালাচ্ছে।

সুভদ্রাও জেগে উঠেছে। সুরপতি লাফিয়ে উঠে তার হাত ধরে টেনে বলল, পালাও। আমাদের এখনও দেখতে পায়নি।

মুদ্রাভরা পেটিকাটা সব সময় তার কোমরে বাঁধা থাকে, তাই সে অন্য কোনও জিনিসপত্র নেবার চেষ্টা করল না। ঘুমন্ত প্রবকুমারকে বুকে জড়িয়ে সে ছুটল।

বেশি দূর যেতে পারল না। সুভদ্রা বেশি জোর ছুটতে পারেনি। পারবেই-বা কী করে! ইতিমধ্যে তিন-চার জন দস্যু সুভদ্রাকে ঘিরে ফেলেছে। সুরপতি পেছনে তাকিয়ে শিউরে উঠে দেখল, একটি অতিকায় ভীম চেহারার দস্যু সুভদ্রার বুকের আঁচল ধরে টান দিয়েছে।

ধ্রুবকুমারকে সেইখানেই মাটিতে নামিয়ে রেখে সুরপতি আবার ফিরে এল। পাগলের মতো চিৎকার করতে লাগল, ছেড়ে দাও, ওর গায়ে হাত দেবে না।

নানা চিৎকার চেঁচামেচির মধ্যে কেউ সুরপতির কথা শুনতে পেল না ঠিক মতো।

সর্দার বুধনাথ সিং-এর চেহারা প্রায় দৈত্যের মতো। যেমন সে লম্বা, তেমনি বিরাট তার মুখ। মুখ ভরতি দাড়ি গোঁফ, সেই জঙ্গলের মধ্যে জুল জুল করে তার দুটি চোখ। অতিরিক্ত

ভোগবিলাসের জন্য তার সারা গায়ে এখন চর্বি থল থল করছে। সে নিজে ধরে আছে সুভদ্রার হাত, অন্য দুজন দস্যু সুভদ্রার বসন ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। সুভদ্রা চিৎকার করছে না, শুধু ছটফট করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে। সে ক্ষমতা তার নেই।

শয়তান! সুরপতি ছুটে গিয়ে বুধনাথের দাড়ি চেপে ধরল এক হাতে, অন্য হাতে ওর মুখে মারল একটা ঘুষি।

ছেড়ে দে, ছেড়ে দে ওকে!

বুধনাথ একঝটকা দিয়ে সুরপতিকে ঠেলে দিতে গেল। কিন্তু সুরপতি শক্ত করে তার দাড়ি চেপে ধরে আছে। তখন এক জন দস্যু লোহার ডাণ্ডা দিয়ে সুরপতির সেই হাতের ওপর মারল। সুরপতির হাত অবশ হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ বুধনাথ সুরপতির কোমর ধরে শূন্যে তুলে খেলনার মতো তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে।

সুরপতি গিয়ে পড়ল একটা পাথরের ওপর। সে স্পষ্ট বুঝতে পারল, তার মাথা ফেটে গেছে। রক্ত বেরুচ্ছে গল গল করে। কিন্তু সে এখন কিছুতেই জ্ঞান হারাতে চায় না।

বুধনাথ চেঁচিয়ে উঠল, এই আওরতকে আমার চাই। এক জন বলল, সর্দার, একে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব? বুধনাথ বলল, না না, আমি এক আওরাৎকে দু'বার চাই না। তোরা সরে যা, সরে যা! আর এক জন বলল, সর্দার, তোমার হয়ে গেলে আমাকে দিয়ে দিও!

বুধনাথ হা-হা করে হেসে উঠল। সেই হাসির শব্দ সুরপতির কানে বাজল কামান গর্জনের মতো। সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল।

বুধনাথ ততক্ষণে সুভদ্রার অর্ধেক শরীর নগ্ন করে ফেলেছে। সুরপতির বিস্ফারিত চোখের ওপর স্থির দৃষ্টি ফেলল সুভদ্রা। তারপর এই প্রথম সে তীব্র গলায় চেঁচিয়ে উঠল, বিষ দাও! আমাকে বিষ দাও। এখনই।

সুভদ্রার গলায় একটা দারুণ আর্তি ছিল। সে স্বামীর কাছে অনুরোধ করছে, কোনওক্রমে তাকে বাঁচাতে। অন্তত বিষ দিয়ে বাঁচাতে।

সুরপতি দুর্বল বা কাপুরুষ নয়। কিন্তু সে নিরস্ত্র। এমনকী বিষও সঙ্গে নেই! একবার সে ভাবল ওদের বলবে, আমার যা টাকা-পয়সা আছে, সব নিয়ে তোমবা আমার স্ত্রীকে ছেড়ে দাও। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝল, এ প্রস্তাব দিয়ে কোনও লাভ নেই। তাহলে তারা টাকা-পয়সা তো নেবেই, তবু সুভদ্রাকে ছাড়বেনা এবং তাকেও হত্যা করবে।

এই সময় কোথা থেকে তীরের মতো ছুঠে এল এক জন। তার হাতে খোলা তলোয়ার। সুরপতি দেখল, সেই লোকটা ধনরাজ।

ছেড়ে দে, ওকে ছেড়ে দে, কুকুর!

এই কথা বলতে বলতে সে বুধনাথের দিকে তলোয়ারের কোপ চালাল। ঠিকমতো লাগলে সেই কোপেই বুধনাথের মুণ্ড খসে পড়ত ধড় থেকে। কিন্তু কোপটা লাগল বুধনাথের বাম বাহুতে। বাহুতে কবজ আঁটা আছে বলে তার তেমন লাগল না। বুধনাথ একটা পশুর মতো গর্জন করে নিজের তলোয়ার নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ধনরাজের দিকে। শুরু হল দু'জনের যুদ্ধ। সুরপতি আশা হল ধনরাজ ঠিক জিতবে। সে-ই রক্ষা করবে সুভদ্রার সম্মান।

কিন্তু দস্যুদলের কোনও নীতিবোধ নেই। ওদের দুজনের যুদ্ধ চলার মধ্যেই আর এক জন দস্যু পেছন থেকে আক্রমণ করল ধনরাজকে। তার তলোয়ারের এক আঘাতে ধনরাজের মুণ্ডু শরীর থেকে ঝুলে পড়ল অনেকখানি। এক ঝলক রক্ত এসে লাগল সুরপতির গায়ে। তার বুকের মধ্যে হাহাকার উঠল। একটাও শব্দ উচ্চারণ না করে প্রাণ দিল ধনরাজ। তার শরীরটা ধপাস করে মাটিতে পড়ে কিছুক্ষণ ছটফট করে থেমে গেল।

সুরপতি ধনরাজের তলোয়ারটা কুড়িয়ে নিতে যাচ্ছিল, কিন্তু মুখ ঘুরিয়ে দেখল, সেখানে অন্তত সাত-আট জন দস্যু। সবাই সশস্ত্র। তারা সুরপতিকে লক্ষ্য করছে না, কিন্তু সুরপতি

একবার রুখে দাঁড়ালেই তারা চারদিক থেকে ঘিরে তাকে কুচি কুচি করে কাটবে। সুরপতি এক মুহূর্ত দ্বিধা করল। মানুষের বেঁচে থাকার টান বড় প্রবল।

বুধনাথ ততক্ষণে আবার সুভদ্রাকে জাপটে ধরে শুইয়ে ফেলার চেষ্টা করছে।

বাবা! বাবা!

সুরপতি আবার চমকে উঠল। ধ্রুবকুমারের গলা। ধ্রুবকুমারকে সে একটু দুরে শুইয়ে রেখে এসেছিল। সে জেগে উঠেছে, গোলমাল শুনে এই দিকেই ছুটে আসছে।

সুরপতি সেই আহত অবস্থাতেও লাফিয়ে উঠল। সুভদ্রার দিকে আর না তাকিয়ে সে ছুটল উলটো দিকে। তার ছেলেকে বাঁচাতেই হবে। শুধু দস্যুদের হাত থেকেই নয়। ধ্রুবকুমার যেন কোন ক্রমেই তার মায়ের এই অপমানের দৃশ্য না দেখে। মাঝপথে ছেলেকে ছোঁ মেরে তুলে বুকে জড়িয়ে সুরপতি অন্ধের মতো ছুটল। মিলিয়ে গেল দূর বনের মধ্যে।

২. ছেলেকে বুকে জড়িয়ে

ছেলেকে বুকে জড়িয়ে কতক্ষণ ছুটেছিল জানে না। তার মাথা দিয়ে রক্ত ঝরছে, শরীর ক্রমশ অবসন্ন হয়ে আসছে, এক সময় সেঝুপকরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল। তারপর কী হয়েছে, তার মনে নেই।

যখন তার জ্ঞান ফিরল, তখন ভোর হয়ে গেছে। শরীর অত্যন্ত দুর্বল, তবু সে কোনও ক্রমে উঠে বসল। এ-দিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজল ছেলেকে। প্রথমে দেখতে পেল না। তারপর চোখে পড়ল খানিকটা দূরে একটা শুকনো পাতার স্তূপের মধ্যে থেকে দুটি কচি পা বেরিয়ে আছে। সুরপতি অজ্ঞান হয়ে পড়ার পরে কিছুক্ষণ ধ্রুবকুমার জ্যোৎস্নার আলোয় গাছের ডাল-পাতা নিয়ে খেলা করেছে। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছে এক সময়।

সুরপতি একটু একটু করে গত রাতের সব কথা মনে করার চেষ্টা করল। যেন পুরোটাই একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন। শেষ ছবিটা মনে পড়তেই তার মাথা ঝিম ঝিম করে উঠল, মনে হল আবার অজ্ঞান হয়ে পড়বে। ধনরাজ সুভদ্রাকে বাঁচাবার জন্য শুধু শুধুছুটে এসে প্রাণ দিল। তার মুণ্ডুটা ঝুলে পড়েছিল, তার রক্ত এখন লেগে আছে সুরপতির গায়ে। সুভদ্রা কোথায়?

ছেলেকে তক্ষুনি না জাগিয়ে সুরপতি উবুহয়ে বসে আঁ আঁ করে কিছুক্ষণ কাঁদল। খানিকটা কেঁদে নিলে তার শরীর হালকা হবে না, সে উঠে দাঁড়াতে পারবে না।

এক জোড়া কাঠবিড়ালি সামনের গাছটায় বারকয়েক ওঠা-নামা করছিল, তারা সুরপতির কান্না শুনে থমকে দাঁড়িয়ে বেল। এক ঝাক ছাতারে পাখি গাছের ডালে বসে খুব গোলমাল করছিল, তারাও চুপ করে গেল ওই কান্নায়।

খানিকটা বাদে সুরপতি চুপ করল। বুকের মধ্যে দমবন্ধ ভাবটা একটু কেটেছে। হাত দিয়ে সে মাথার ক্ষতস্থানটা অনুভব করল। অনেকখানি খোদল মতো হয়ে আছে। জমাট বেঁধে আছে রক্ত।

পরনের কাপড় থেকে খানিকটা ছিঁড়ে সুরপতির মাথার ক্ষতস্থানে একটা ফেট্টি বাঁধল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। পা দুটো খুবই দুর্বল, তবু হাঁটতে পারবে কোনও ক্রমে।

শুকনো পাতা সরিয়ে সে ছেলেকে জাগাল। চোখ মেলেই ধ্রুবকুমার জিজ্ঞেস করল, মা কোথায়?

সুরপতির চোখে জল এসে যাচ্ছিল। কোনও ক্রমে নিজেকে সামলাল। ধরা গলায় বলল, চলো বাবা, আমরা মাকে খুঁজতে যাই।

মা কোথায় গেছে?

মাকে ডাকাতরা ধরে নিয়ে গেছে।

কেন?

ডাকাতরা যে খুব পাজি হয়।

বাবা, তুমি ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করোনি?

করেছিলাম তো। কিন্তু তারা যে সংখ্যায় অনেক। আমি পারিনি।

আমি ডাকাতদের মারব।

ছেলের হাত ধরে সুরপতি টলতে টলতে হাঁটতে লাগল। পথ খুঁজে পাবার কোনও অসুবিধে নেই। তার মাথা থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়েছে মাটিতে, তাই দেখে পথ বেশ চেনা যায়।

এক সময় তারা কাল রাত্রির ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছল। যেন ছোটখাটো একটা যুদ্ধের দৃশ্য। বণিকরা অনেকেই পালিয়েছে, মরেছেও প্রায় সাত-আট জন। তাদের মধ্যে পূর্ণানন্দকে চেনা যায়। পূর্ণানন্দ মারা গেছেন বসে থাকা অবস্থায়। একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে তার মৃতদেহটা সেই ভাবেই রয়েছে। পাশেই একটা ঘোড়ার মৃতদেহ বীভৎস ভাবে পা উলটিয়ে পড়ে আছে।

নিজের জায়গায় এসে সুরপতি দেখল ধনরাজের দেহটা। মুণ্ডুটা একপাশে ঝুলছে, বেরিয়ে আছে গলার নালি। এর মধ্যেই তার মুখের ওপর মাছি ভন ভন করছে।

ধনরাজকে দেখে সুরপতির চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। এই ধনরাজের ওপর সে কত রাগ করেছিল। ধনরাজ তো অনায়াসেই পালিয়ে বাঁচতে পারত। কিন্তু এই যুবা বয়েসে সে প্রাণ দিল এক জন প্রায় অচেনা নারীর প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টায়। এই মহৎপ্রাণের উদ্দেশে মনে মনে প্রণাম জানাল সুরপতি।

এইসব ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে ধ্রুবকুমার একেবারে থ হয়ে গেছে। তার মুখে দিয়ে আর কথা সরছে না।

কাল রাতে শেষ যেখানে সুভদ্রাকে দেখে গিয়েছিল সুরপতি, সুভদ্রা এখন সেখানে নেই। ডাকাতরা তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে? তাহলে তক্ষুনি তক্ষুনি তার ওপর অত্যাচার করার চেষ্টা করছিল কেন?

বুধনাথ যে বলেছিল, এক আওরতকে সে দু'বার চায় না! কিন্তু তার দলের লোকরা চাইতে পারে। কোথায় গেল সুভদ্রা? সুভদ্রাকে খুঁজে পেতেই হবে। সুভদ্রাকে ছাড়া সুরপতি বাঁচবে না। শিশু ধ্রুবকুমারকেই-বা সে বাঁচাবে কী করে?

একটু খুঁজতেই সুভদ্রাকে পাওয়া গেল একটা ঝোঁপের পাশে। এক নজর দেখেই মনে হয় প্রাণ নেই। তার শরীরে একটুকরো বস্ত্র নেই, বিভিন্ন জায়গায় ছোপ ছোপ রক্ত, গাল ও

বুকে নখ দিয়ে চেরার দাগ। যেন অনেকগুলো নরপশু তাকে আঁচড়ে খুবলে খেয়েছে। সুভদ্রাকে দেখে সুরপতির কান্না এল না, তার গলা শুকিয়ে গেল।

'মা! ' বলে চিৎকার করে ধ্রুবকুমার ছুটে গেল সুভদ্রার দিকে। জননীকে নগ্ন অবস্থায় দেখে বালকের বিকার হয় না, তবুসুরপতি অল্প দূরে পড়ে থাকা সুভদ্রার শাড়িটা কুড়িয়ে এনে তার শরীরটা ঢেকে দিল।

সুভদ্রাকে একটু স্পর্শ করতেই সুরপতির মনে হল, তার দেহে এখন একটু একটু উত্তাপ আছে। তাড়াতাড়ি সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সুভদ্রার নাকের কাছে হাত রাখল। খুব ক্ষীণ নিশ্বাস টের পাওয়া যায়।

সুরপতি ব্যাকুল ভাবে ডেকে উঠল, সুভদ্রা, সুভদ্রা।

ধ্রুবকুমার ডাকল, মা! মা!

সুভদ্রা সাড়া দিতে পারে না।

সুরপতি তখন দৌড়ে গেল ঝরনার কাছে। নিজের গায়ের জামাটা খুলে জবজবে করে ভিজিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এল। সেই জামা চিপড়ে জল ছড়াল সুভদ্রার চোখে-মুখে।

সুভদ্রার তবু জ্ঞান এল না।

দস্যুরা পিতল-কাঁসার ভাণ্ডগুলো নেয়নি। সে-রকম কয়েকটা ছড়িয়ে আছে এ-দিক ও-দিকে। তার মধ্যে থেকে একটা বড় ভাণ্ড বেছে নিয়ে সুরপতি অনেকখানি জল নিয়ে এল আবার। সুভদ্রার ক্ষতস্থান মুছে দিতে লাগল। তার ঠোঁট ফাঁক করে ফোঁটা ফোঁটা জল দিতে লাগল মুখে। তবু সুভদ্রা চোখ মেলে না।

সুভদ্রার প্রাণ এখনও যে আছে তা নিশ্চিত, কিন্তু কোনও এক কঠিন আঘাতের ফলে তার জ্ঞান কিছুতেই ফিরে আসছে না। চিকিৎসার জন্য তাকে এখনই কোনও বৈদ্যের কাছে

নিয়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু কী করে নিয়ে যাবে? সুরপতি অসহায়। তার নিজের শরীর দুর্বল। সামনে আর কতটা পথ পার হলে একটা নগর মিলবে তার ঠিক নেই। এখন উপায় কী?

দারুণ নৈরাশ্যের জন্যই সুরপতির মনে আরও কয়েকটা বিশ্রী কথা জাগল। সুভদ্রা তার কাছে বিষ চেয়েছিল, কোনও ক্রমে তাকে বিষ দিতে পারলেই বোধহয় অনেক ভাল ছিল। তাহলে এ গ্লানি তাকে সইতে হত না। এখন সুভদ্রাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও বোধহয় কোনও লাভ হবে না, পৌঁছবার আগেই মারা যাবে। তাছাড়া সুভদ্রাকে বাঁচিয়ে তুলেই বা লাভ কী? দেখে মনে হয়, অন্তত চার-পাঁচটি পশু তার ওপর অত্যাচার করেছে। এরপর আর কোনও বর্ণহিন্দু নারীর সমাজে স্থান হয় না। সমাজ তাকে চাপ দেবে সুভদ্রাকে পরিত্যাগ করার জন্য।

তার বদলে আর এক কাজ করলে হয় না? সেটাই সব চেয়ে সহজ। জীবনের এতগুলি বিড়ম্বনা সুরপতি আর সহ্য করতে পারছে না। তার পক্ষেও এখন আত্মঘাতী হওয়া ভাল। সে নিজেও এখানে সুভদ্রার পাশাপাশি শুয়ে থেকে প্রাণ বিসর্জন দিক। একটা অস্ত্রের খোঁজে সুরপতি এ-দিক ও-দিক তাকাল।

ধনরাজের তলোয়ারটা তার পাশেই পড়ে ছিল। সেটা তুলে নিয়ে এল সুরপতি। এই অস্ত্রের এক কোপে সে সুভদ্রার প্রাণ এখনই শেষ করে দিক, তারপর নিজের গলাটাও কেটে ফেলবে।

সুভদ্রা চোখ বন্ধ করে আছে, কিন্তু ক্ষীণ নিশ্বাসে তার বুক সামান্য দুলছে, তাতেই প্রাণের লক্ষণ বোঝা যায়। এমন সোনার প্রতিমা, তার আর বেঁচে থাকার অধিকার রইল না। সুরপতি তলোয়ারটা উঁচু করে ধরল, তার হাত কাঁপছে, তার শরীর খুবই দুর্বল, তবু এক কোপে শেষ করে দিতে হবে। যেন আর জ্ঞান না ফেরে সুভদ্রার। তারপর নিজের গলাটাও এক কোপে...।

হঠাৎ ধ্রুবকুমারের দিকে তার চোখ পড়ল। তাহলে ধ্রুবকুমারের কী হবে? এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে একা একা ওই শিশুটি কোথায় যাবে?

পরক্ষণেই সুরপতির মন দারুণ অনুতাপে ভরে গেল। ছি ছি, এ-সব সে কী কথা ভাবছিল? তার প্রাণের চেয়েও প্রিয় এই সুভদ্রা, তাকে সে বাঁচাবার চেষ্টা করবে না? যতক্ষণ তার দেহে একবিন্দু রক্ত আছে, ততক্ষণ সে সুভদ্রাকে মরতে দিতে পারে? একটা কুকুর যদি সুভদ্রাকেহঠাৎ কামড়াত, তাহলে কী সে সুভদ্রাকে পরিত্যাগ করার কথা চিন্তা করতে পারত? তাহলে কটা মানুষ-পশু তাকে কামড়েছে বলেই-বা কেন সে সুভদ্রাকে পরিত্যাগ করবে? আর সমাজ? সমাজ তাকে কী দিয়েছে? সে যখন বিপদে পড়েছিল, বিষয়-সম্পত্তি সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তখন কি এই সমাজ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তার দিকে? সমাজ কিছুই দেয় না, শুধুশাসন করার জন্য মুখিয়ে থাকে। সে আর কোনও দিন তার পুরনো সমাজে ফিরে যাবে না। সে বসতি নেবে নতুন এক দেশে, যেখানে কেউ তাকে চিনবে না, কেউ তাদের পূর্বপরিচয় জানবে না। সেখানে নতুন ভাবে জীবন শুরু হবে।

সুরপতি সুভদ্রাকে তুলে নিল নিজের কাঁধে। তারপর বলল, বাছা ধ্রুব, তুই নিজে হেঁটে যেতে পারবি তো?

বিপদের সময় শিশুরাও অনেক কর্মক্ষম হয়ে যায়। গত কাল পর্যন্ত খানিক দূর হাঁটার পরই ধ্রুবকুমার কারুর না কারুর কোলে চড়ত, আজ সে একবারও সেকথা বলল না। দিব্যি হেঁটে যেতে লাগল সামনে সামনে।

সুরপতিই পারছে না। ঘুমন্ত বা অজ্ঞান মানুষের দেহ যেন বেশিভারি হয়ে যায়। সুরপতির নিজের শরীরও খুব দুর্বল। চাপলাগতেই তার মাথা দিয়ে আবার রক্ত বেরুচ্ছে। কয়েক পাগিয়েই সে হাঁপিয়ে পড়ছে খুব। সুভদ্রাকে নামিয়ে দিয়ে জোরে জোরে শ্বাস টানছে আর ব্যগ্রভাবে পরীক্ষা করে দেখছে, সুভদ্রার তখনও শ্বাস আছে কিনা।

এইরকম ভাবেই কয়েক দণ্ড চলার পর দূরে একটা গ্রামের আভাস দেখা গেল। এতক্ষণে সুরপতি প্রায় ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল, গ্রামটা দেখতে পেয়ে আবার তার শরীরে রক্তসঞ্চার হল। গ্রাম মানেই বিশ্রাম, খাদ্য, সুভদ্রার জন্য চিকিৎসা।

গ্রামটি খুবই ছোট। কয়েক ঘর মাত্র কৈবর্তের বাস। কোনও চিকিৎসক এখানে নেই। তবে এক বৃদ্ধা জড়িবুটির টোটকা দেয় গ্রামবাসীদের। তাকে খুঁজে বার করা হল।

গ্রামের অনেক পুরুষ ডাকাতির খবর শুনে হইহই করে ছুটে গেল বনের দিকে। এরা সবাই বুধনাথ সিংকে চেনে। তাকে চটাবার সাল এদের নেই। এরা ছুটে গেল, মৃতদের যা কিছু জিনিসপত্র এখনও ছড়ানো ছেটানো রয়েছে, সেগুলো সংগ্রহ করতে। ডাকাতরা তো সব নেয় না।

এক কৈবর্তের বাড়ি থেকে দুধ, মুড়ি আর কলা সংগ্রহ করে সুরপতি ছেলেকে আগে খাওয়াল, নিজেও কিছু খেতে গেল, কিন্তু পারল না। কিছু মুখে দিলেই বমি হয়ে যাচ্ছে। মাথায় অসহ্য ব্যথা, মনে হচ্ছে সুরপতি যে-কোনও মুহূর্তে অজ্ঞান হয়ে যাবে। কিন্তু অসম্ভব মনের জোরে তাকে চোখ মেলে থাকতে হচ্ছে। এই সময় তার অসুস্থ হয়ে পড়লে চলবে না। বালক ধ্রুবকুমার তাহলে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়বে। সুরপতি ধ্রুবকুমারকে নিজের কোলের কাছে বসিয়ে রাখল। সুভদ্রার ওপর ততক্ষণ বৃদ্ধার চিকিৎসা চলছে।

বৃদ্ধা একটা কী যেন গাছের শিকড়ে তখন আগুন জ্বালিয়েছে। তার থেকে অত্যন্ত দুর্গন্ধময় ধোঁয়া বেরুচ্ছে। সেই জ্বলন্ত শিকড়টা সুভদ্রার নাকের কাছে ধরে বুড়ি বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে লাগল। অনেকক্ষণ সেই রকম চলল। তারপর ভারভার জল এনে ঢালা হতে লাগল তার গায়ে। আবার সেই দুর্গন্ধ শিকড়ের ধোঁয়া। এই রকম চলল।

একসময় সুভদ্রার শরীরে স্পন্দন দেখা দিল, তারপর আস্তে আস্তে চোখ মেলল।

আনন্দে বুকের মধ্যে ধক করে উঠল সুরপতির। তাহলে আর চিন্তা নেই। সুভদ্রা বেঁচে উঠেছে। তার প্রাণের পুত্তলি সুভদ্রা না বাঁচলে সে নিজেই-বা বেঁচে থাকত কী করে? গত রাত্রির দুঃস্বপ্ন এক সময় মিথ্যে হয়ে যাবে। আবার তারা সুখের সংসার পাতবে।

কিন্তু সুভদ্রা কোনও কথা বলল না।

সুরপতি বার বার ডাকতে লাগল, সুভদ্রা! সুভদ্রা।

ধ্রুবকুমার ডাকল, মা, মা!

সুভদ্রা কোনও সাড়া দিল না। সে শুধু এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে।

ধ্রুবকুমারকে বসিয়ে দেওয়া হল সুভদ্রার কোলে। তখন তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। কিন্তু কথা বলতে পারলো না। যেন তার বাক্যহরণ হয়ে গেছে।

আরও কিছুক্ষণ চিকিৎসা চলল, তাকে কথা বলার জন্য। কিছুতেই কিছু হল না। তাকে গরম দুধ খাওয়াবার চেষ্টা করা হল। সুভদ্রা খেতে চায় না। জোর করে তার মুখে দুধ ঢেলে দিলেও মুখের বেয়ে দুধ নেমে আসে। শুধু অবিরল ঝরছে তার চোখের জল।

বুড়ি দেয়াসিনী বলল, এর বেশি চিকিৎসা করার সাধ্য তার নেই। তবে আর কিছু পথ গেলেই অন্য রাজ্য। সেই রাজ্যে দারুকেশরনামে এক বড়নগর আছে। সেইনগরের রাজবৈদ্য বাসবদত্ত একেবারে ধন্বন্তরি। তাঁর কাছে গেলে আর কোনও চিন্তা থাকবেনা।

দারুকেশর নামটা শুনে সুরপতির বুকের মধ্যে আবার শির শির করে উঠল। ধনরাজ চেয়েছিল তাদের ওই নগরে নিয়ে যেতে। তখন সুরপতি মনে মনে রাজি হয়নি। এখন তাকে ওই জায়গাতেই যেতে হবে, কিন্তু ধনরাজ থাকবে না। আহা!

দারুকেশ্বর পায়ে হেঁটে গেলে এখন দেড় দিনের পথ। তবে গোরুর গাড়িতে গেলে আরও একটু তাড়াতাড়ি হতে পারে।

সুরপতির কোমরে বাঁধা টাকার বটুয়াটা ঠিকই আছে। দস্যুরা সুভদ্রার মতো রত্নকে পেয়ে আর সুরপতির অন্য ধনরত্নের কথা চিন্তা করেনি। এই শেষ সম্বল চলে গেলে সুরপতির আর কিছুই করার থাকত না।

এক কৈবর্তের কাছ থেকে সুরপতি একটি গো-শকট ভাড়া করল। তাতে খড় বেছানো হল খুব পুরু করে। তারপর কিছু চিড়ে আর কলা রসদ হিসেবে নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়ল।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়, তারপর সন্ধ্যা আসে। সুভদ্রা ঠায় বসে থাকে বাইরের দিকে চেয়ে। একটি শব্দ উচ্চারণ করেনা। সুরপতি কিংবা ধ্রুবকুমার তাকে বার বার কিছু প্রশ্ন করতে গেলেই সে অমনি চোখের জল ফেলে। তখন সুরপতি বলে, থাক থাক।

সুভদ্রার অপরূপকণ্ঠস্বর সুরপতির কানে সুধা বর্ষণ করত। সুভদ্রার সামনে বসে থেকেও সুরপতি তা শুনতে পাচ্ছে না বলে তার কষ্ট হচ্ছে খুবই। তবু সে মনকে বোঝাচ্ছে যে, সুভদ্রা কথা বলতে পারুক বা না-পারুক, তাতে কিছু যায় আসে না। সে যে বেঁচে আছে, এই তো যথেষ্ট!

মায়ের কাছ থেকে কথার উত্তর না পেয়ে অবুঝ ধ্রুবকুমার এক সময় ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। এখন সে ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছ। ওইটুকু ছেলের ওপর দিয়ে এই কদিনেই কত রকম চাপ যাচ্ছে। তার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বড় মায়া হয় সুরপতির। পৃথিবীতে কোনও শিশুর কষ্ট পাওয়ার মতো করুণ দৃশ্য আর নেই। সুরপতি ধ্রুবকুমারের মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে আদর করে। তারপর ফিস ফিস করে বলে, সুভদ্রা, তোমার কথা বলার দরকার নেই। তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ তো? আমরা দারুকেশ্বরেই থাকব, আর কোথাও যাব না। আমাদের নতুন বাড়ি হবে, আমাদের আবার সাজানো সংসার হবে।

সুভদ্রা মুখটাও ফেরায় না। বাইরের দিকে ও তাকিয়ে থাকে।

সুরপতি একবার সুভদ্রাকে ধরে দারুণ জোরে ঝাঁকুনি দিল। যদি তাতে সুভদ্রার ঘোর ভাঙে। কিন্তু তাতে ফল হল উলটো। সুভদ্রার চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে গেল, ঠোঁট দিয়ে

ফেনা গড়াতে লাগল, তারপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল ধপ করে। ভয়ে বুক কেঁপে উঠল সুরপতির। এ আবার কী নতুন রকম সঙ্কট! তাড়াতাড়ি গো-শকট থামিয়ে সে পথের পাশের এক ইদারা থেকে জল এনে ঢালতে লাগল সুভদ্রার মাথায়। তবু সুভদ্রার জ্ঞান ফেরে না। তাহলে কি সুভদ্রা মরেই গেল? এ-কথা ভাবলেই সুরপতির মাথা ঝিম ঝিম করে। সেই বৃদ্ধা দেয়াসিনীর দেওয়া কয়েক টুকরো শিকড় ছিল সুরপতির কাছে। সেগুলি পুড়িয়ে তার কটু গন্ধময় ধোঁয়া সুভদ্রার নাকে দিতে লাগল সুরপতি। অনেকক্ষণ বাদে সুভদ্রার চোখের একটা পাতা পড়ল।

বেঁচে আছে, সুভদ্রা বেঁচে আছে! সুরপতি আনন্দে কেঁপে উঠল আবার। সুভদ্রার পিঠে হাত রেখে সুরপতি বলল, তুমি ঘুমোও। তোমাকে আর কথা বলাবার চেষ্টা করব না। তুমি শুধু বেঁচে থাকো, সেই আমার যথেষ্ট।

একটু পরে, সুভদ্রা ঘুমিয়ে পড়েছে, সুরপতি ঠায় বসে আছে। নিজের মাথার যন্ত্রণায় তার চোখ ঝাঁপসা হয়ে আসছে। এই যন্ত্রণার কথা সে কারুর কাছে বলতে পারবে না। সুভদ্রা এখনও জানে না যে, সুরপতি কতখানি আহত! একা একা এতখানি কষ্ট সহ্য করা যেন আরও শক্ত।

ধ্রুবকুমারের পাশে সুরপতিও ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ এক সময় তার ঘুম ভেঙে গেল। তার পায়ের ওপর যেন কার হাতের স্পর্শ। চোখ মেলে দেখল, ঠিক অন্যান্য রাতের মতো, সুভদ্রা তার পা টিপে দিচ্ছে। সুভদ্রার চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়ছে তার পায়ে।

তাহলে তো সুভদ্রার বোধ আছে। তার স্মৃতিও আছে! সুরপতি ধড়মড় করে উঠে বসে আবেগের সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, সুভদ্রা! সুভদ্রা! তুমি যে আমার কতখানি, তা জানো না।

সুভদ্রাকে সে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল।

দারুকেশ্বরতারা পৌঁছল মধ্যরত্রির কাছাকাছি। নগরে ঠিক ঢোকার মুখেই একটা বেশ বড় সরাইখানা। তখন সেখানে বাতি জ্বলছে।

সুরপতি ঠিক করল, রাতের মতো সেখানেই আশ্রয় নেওয়া বিধেয় হবে। এত রাত্রে তো আর রাজবৈদ্যকে তোলা যাবে না। তাছাড়া সুভদ্রা তো এখন অনেকটা ভালই আছে। তার কথা বলার চিকিৎসা কাল করালেও হবে।

গোরুর গাড়ির চালককে সে সেখানেই থামতে বলল। তারপর নেমে হাঁক-ডাক করতে একটি মাঝবয়সী লম্বা মতো লোক বেরিয়ে এসে বলল, কী চাই? আমার এখানে জায়গা নেই। পথ দেখো।

সুরপতি চিন্তায় পড়ল। তাহলে কোথায় যাওয়া যায়?

সে জিজ্ঞাসা করল, মহাশয়, কাছাকাছি কি আর কোথাও কোনও চটি বা সরাইখানা আছে?

লোকটি বলল, দারুকেশ্বরের দু'প্রান্তে দুটি সরাইখানা। অন্যটা এখান থেকে তিন ক্রোশ হবে। নগরের মধ্যে ধর্মশালা আছে দুতিনটি। তবে এখন রাসের মেলা চলছে, ধর্মশালায় স্থান সঙ্কুলান হবে কিনা সন্দেহ। লোকে তো বিনা পয়সার জায়গাতেই আগে যায়।

সুরপতি বলল, আমার সঙ্গে অসুস্থ স্ত্রী ও শিশুপুত্র রয়েছে। আপনার এখানে কি কোনও ক্রমেই আশ্রয় পাওয়া যাবেনা?

সরাইখানার মালিকের দশাসই চেহারা। দুই কানে দু'টি কুণ্ডল। চোখ দুটি রক্তবর্ণ। বোঝাই যায়, লোকটি সন্ধ্যাকাল থেকেই সুরাপান করছে। লোকটির মুখখানিতে কিন্তু ক্রুরতার চিন্তা নেই, বরং খানিকটা যেন শিশুসুলভ ভাব।

এত রাত্রেও সরাইখানার বিভিন্ন কক্ষ থেকে হাসি এবং গানের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তার সঙ্গে মিশে আছে স্ত্রীলোকের কণ্ঠ। জায়গাটা বোধহয় ভাল না। অন্য জায়গায় চলে গেলে

হত। কিন্তু এত রাত্রে আর কোথায়ই-বা যাবোনগরের অন্য প্রান্তে আর একটি সরাইখানা আছে, যদি সেখানে গিয়েও স্থান

পাওয়া যায়? সুরপতি নিজেই যে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না।

সে বিনীত ভাবে বলল, মহাশয়, যদি কিছু বেশি অর্থ দিলেও একটা কক্ষ পাওয়া যায়, অন্তত আজকের রাতটার মতো...।

বলভদ্র হুঙ্কার দিয়ে বলল, কী? আমার নাম বলভদ্র, আমাকে কেউ অর্থের প্রলোভন দেখায় না। সৈনিক পুরুষরা আমার সব ক'টা ঘর জুড়ে আছে, আপনি অন্যত্র চেষ্টা দেখুন।

সুরপতি বলল, আমি বড় বিপদে পড়েছি আমার স্ত্রী খুব অসুস্থ। লোকটি কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে সুভদ্রার মুখের দিকে তাকাল। তার মুখে এখন অবগুণ্ঠন নেই। একদৃষ্টে সুভদ্রাকে কিছুক্ষণ দেখে সে অস্ফুট ভাবে বলল, যেন সাক্ষাৎ দেবীপ্রতিমা!

তারপর সুরপতির দিকে ফিরে সে হাঃহাঃ করে হেসে উঠল। হাসতেই থাকল। সুরপতি এ হাসির মর্ম বুঝল না।

লোকটি হাসি শেষ করে বলল, আরে বংশীলাল! তুমি আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না, যতই ছদ্মবেশ ধরো আর যাই করো!

সরাইখানার মালিক সুরপতির কানের কাছে মুখে এনে বলল, তুমি পালাও! এ দেশ ছেড়ে শীগগির পালাও! তোমার কুকীর্তির কথা সবাই জেনে ফেলেছে।

সুরপতি বলল, আপনি এ-সব কী বলছেন? আমি কোন কুকীর্তি করেছি? আমি শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত।

শ্রেষ্ঠী বিনয় পালের স্ত্রীর সঙ্গে তোমার গুপ্ত আশনাইয়ের কথা জানাজানি হয়ে গেলে প্রহরীরা তোমাকে ধরতে পারলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। আবার এ কার সুন্দর স্ত্রী হরণ করে এনেছ? বংশীলাল, ভাল কথা বলছি, শীগগির পালাও।

আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি বংশীলাল নই। শ্রেষ্ঠী বিনয় পালকে আমি চিনি না। আপনি আমার সম্পর্কে এ-রকম অসমীচীন কথা বলছেন কেন? আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী ও পুত্র।

তুমি বংশীলাল নও! আমি নিজের চোখকে অবিশ্বাস করব? তুমি ভেবেছ, তুমি মাথায় একটা ফেট্টি বেঁধেছ বলেই লোকে তোমাকে চিনতে পারবে না? এই রমণী তোমার স্ত্রী? বংশীলাল সাতজন্মে বিয়ে করেনি। বেশ তো, এই রমণী নিজের মুখে বলুক, তুমি এর স্বামী!

সুরপতি প্রমাদ গুনল। সুভদ্রা যে কথা বলতে পারছে না, সে কথা কি সরাইখানার মালিক বিশ্বাস করবে? সুভদ্রা তো সব শুনতে পাচ্ছে, সে এই বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করবে না?

সে ব্যাকুল ভাবে বলল, সুভদ্রা, একটা কথা বলো! এই লোকটিকে বলে দাও, আমি বংশীলাল নই। আমি তোমার স্বামী!

সুভদ্রা নির্বাক।

সরাইখানার মালিক হা-হা করে হাসতে লাগল। তারপর বলল, এসব চালাকি আবার কবে থেকে শুরু করেছ? সন্তান সমেত এই রমণীকে বার করে এনে কার ঘরের সর্বনাশ করেছ? তুমি তো আগে গোপনেই কাজ সারতে, এখন একেবারে প্রকাশ্যে? ওহে বংশীলাল, তোমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, এইনগর থেকে ভাগো।

বংশীলাল কে?

তুমিই বংশীলাল, তুমি নিজেই জানো তুমি কে।

সুরপতি এগিয়ে গিয়ে সুভদ্রার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলতে লাগল, বলল বলল সুভদ্রা, একবার অন্তত বলল।

সেই গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল বালক ধ্রুবকুমারের। সুরপতির ও-রকম ব্যাকুল চিৎকার শুনে সে ভয় পেয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে সে সুরপতিকে জড়িয়ে ধরে ডাকল, বাবা, বাবা মার কী হয়েছে? মা কথা বলছে না কেন?

বলভদ্র বলল, বাবাঃ। এই শিশুটিকেও বাবা ডাকতে শিখিয়েছ? তোমার আবার সন্তান হল কবে? তুমি তো বাপু ও-সব ঝামেলায় কখনও যাও না! তুমি তো ভ্রমরের মতো ফুলে ফুলে শুধু মধু খাও! বিবাহিতা নারীদের প্রতিই তোমার বেশি লোভ।

সুরপতি এবার কঠোর ভাবে বলল, সাবধান। আপনি সংযত হয়ে কথা বলুন। ঠিক আছে, আপনি আশ্রয় দেবেন না, আমরা চলে যাচ্ছি।

হাসি থামিয়ে সরাইখানার মালিক বক্রচোখে পর্যায়ক্রমে তাকাতে লাগল সুরপতি আর সুভদ্রার দিকে। তারপর সুরপতির কাঁধে চাপড় মেরে বলল, তুমি সত্যিই বংশীলাল নও! তাহলে আপনি কে?

আমার নাম সুরপতি, নিবাস ছিল সপ্তগ্রামে। স্ত্রী ও পুত্র নিয়ে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়েছিলাম, পথে দুবৃত্তের আক্রমণে আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।

লোকটি বলল, আমার নাম বলভদ্র। বিপদগ্রস্ত মানুষকে আমি কখনও ফেরাই না।

সরাইখানার পিছনে একটি ছোট্ট ঘর, তৈজসপত্রে ঠাসা। সেগুলি বার করে নিয়ে সেখানেই স্থান দেওয়া হল সুরপতিদের। খড়ের ওপর কম্বল পেতে বানানো হল শয্যা। আপাতত তাই যথেষ্ট।

সুভদ্রা ও ধ্রুবকুমারকে সেই ঘরে বসিয়ে রেখে আবার বাইরে বেরিয়ে এল সুরপতি।

সরাইখানার মালিক বলভদ্র তখন বাইরের অলিন্দে বসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গান শুরু করেছে। হাতে একটি সুরাপাত্র।

সুরপতি তার পাশে দাঁড়িয়ে একটি গান শেষ নাহওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর শেষ হতেই বিনীতি ভাবে বলল, আপনি আমাকে একটু সাহায্য করবেন? রাজবৈদ্য বাসবদত্তের গৃহে কোন দিক দিয়ে যেতে হবে, একটু দেখিয়ে দেবেন?

বলভদ্র বলল, কেন, সেখানে গিয়ে কী হবে?

আমার স্ত্রী অসুস্থ। ডাকাতের অত্যাচারে ভয় পেয়ে তার কণ্ঠরোধ হয়ে গেছে। শুনেছি বাসবদত্ত ধন্বন্তরি।

এত রাতের বাসবদত্তকে ডাকতে যাওয়া! হা-হা-হো-হো হি-হি।

কেন, তিনি আসবেন না? যদি যথেষ্ট দক্ষিণা দিই?

আপনি কিছুই জানেন না দেখছি। বাসবদত্ত একজন বিখ্যাত সুরাপায়ী। সন্ধ্যার পর তাকে আর কেউ ডাকতে সাহস করেনা। দেখুন গিয়ে তিনি হয়তো এখন উলঙ্গ হয়ে নৃত্য করছেন কিংবা মাটিতে গড়াগাড়ি দিয়ে গর্দভ-রাগিণীতে গলা সাধছেন।

কী সর্বনাশ। স্বয়ং রাজার যদি রাত্তিরবেলা কোনও ব্যাধি হয়, তাহলে কী হবে?

তিনি বিনা চিকিৎসায় মারা যাবেন, আর কী হবে?

তাহলে এ-রকম সুরাপায়ীকে রাজবৈদ্য রাখা হয়েছে কেন?

তার কারণ দিনেরবেলা স্বয়ং যমরাজও ওঁর কাছে আসতে সাহস পাবেন না। আমাদের এই দারুকেশ্বরে দিনেরবেলা একটাও লোক মরেনি কোনও দিন।

এমন কথা শুনিনি কক্ষনও।

দারুকেশ্বরে অনেক কিছুই নতুন দেখবেন। এক পাত্র সুরা পান করবেন নাকি?

না!

একটু চিন্তা করে সুরপতি আবার জিজ্ঞাসা করল, অন্য কোনও চিকিৎসক ডাকা যায় না?

সন্ধ্যার পর দারুকেশরে কেউ চিকিৎসক ডাকে না। সবাই দারু পান করে। আপনি কিছুই জানেন না দেখছি। আপনাদের সপ্তগ্রামে কী নিয়ম?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুরপতি বলল, সপ্তগ্রামে দিনের বেলাতেও মানুষ মরে।

কাল সকালে বাসবদত্তকে পাবেন। চিন্তা করছেন কেন, বাসবদত্তকে দেখলেই সব রোগ ভয় পেয়ে মানুষের শরীর ছেড়ে পালায়।

হাত মুখ ধুয়ে, সামান্য কিছু খাবার খেযে সুরপতি সুভদ্রার পাশে শুয়ে পড়ল। সুভদ্রাকে কথা বলাবার অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু সুভদ্রা যেন পাথর। তার শরীর তখন জ্বরতপ্ত, নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কোনও ব্যাধি হয়েছে সুভদ্রার। ওষ্ঠ ও অধরও খুব ফুলে আছে, সেটাই কি কথা না বলার কারণ? পশু, পশু, দস্যু বুধনাথ একটা পশু। কোনও দিন যদি হাতের কাছে পায়, সুরপতি তাকে নিশ্চয়ই হত্যা করবে।

বাকিরাত সুরপতির চোখে ঘুম এল না। সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারের ঘুমন্ত নিশ্বাসের শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে। সে নিজেও খুবই ক্লান্ত, সুভদ্রাকে অনেকখানি রাস্তা বহন করে আনতে হয়েছে বলে তার সারা শরীরে ব্যথা, কিন্তু মস্তিষ্কভরা দুশ্চিন্তার জন্য তার ঘুম আসছে না। অবিলম্বে অর্থ-উপার্জনের একটা পথ খুঁজে বার করতে হবে। সঙ্গে যা অর্থ আছে, শুধু বসে তা ব্যয় করলে বেশি দিন তো চলবে না। রাজবৈদ্য বাসবদত্ত চিকিৎসার জন্য কত অর্থ দাবি করবেন কে জানে।

সুভদ্রা সব কাজে সাহায্য করত সুরপতিকে। সে তার মধুর ব্যবহারে সুরপতিকে কখনও বেশি চিন্তিত হতে দিত না। সেই সুভদ্রা এখন অনড়। সে এখন কত কষ্ট পাচ্ছে, সেটা ভেবেই সুরপতির বেশি কষ্ট।

যাক, বেঁচে থাকাটাই বড় কথা। তবু যে সুভদ্রা এত বড় বিপদের পরেও বেঁচে আছে, এটাই যথেষ্ট।

সুভদ্রা শেষ কথা বলেছিল, আমাকে বিষ দাও, বিষ! তারপর থেকে আর সুভদ্রার কোনও কথা শোনেনি সুরপতি।

.

ভোর হবার পর, সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারের তখনও ঘুম ভাঙেনি, সুরপতি উঠে পড়ল। ওদের আর জাগাল না। নিজে প্রাতঃকৃত্য সেরে নিল তাড়াতাড়ি। পোশাক বদলাবার কোনও উপায় নেই, কারণ আর কিছু নেই সঙ্গে। তাই গত কালের অপরিচ্ছন্ন পোশাকটাই পরে নিল। আজই কিছু পোশাক পরিচ্ছদ কিনতে হবে নিজের মাথার ক্ষতস্থানটায় একবার হাত বুলিয়ে নিল সুরপতি। মনে হচ্ছে যেন ব্যথা-বেদনা সব দুর হয়ে গেছে। কী করে এমন হল? ক্ষতস্থানটায় চাপ বেঁধে আছে, কিন্তু বেদনা নেই কেন? আপনাআপনি সেরে গেল? যাই হোক, পরে এ নিয়ে চিন্তা করা যাবে। সুরপতি মাথার রক্তাক্ত ফেট্টিটা খুলে ফেলে দিল মাটিতে। তারপর টাকার পুঁটলিটা সাধানে কোমরে বেঁধে নিল, তারপর বেরিয়ে পড়ল।

৩. রাজবৈদ্য বাসবদত্তের গৃহ

রাজবৈদ্য বাসবদত্তের গৃহটি প্রকাণ্ড। দ্বি-তলের যে-ঘরটিতে তিনি নিদ্রা যান, সে-ঘরে আটটি গবাক্ষ। শীতে গ্রীষ্ম সবসময় সবকটি গবাক্ষ খোলা থাকে। ঘরের মাঝখানে একটি পালঙ্কে তিনি একাকি শয়ন করেন, সকালবেলা তার চোখেমুখে এসে রোদ পড়ে, তখন ঘুম ভাঙে।

বাসবদত্তের শরীরটিও বিরাট। যমরাজেরও ভয় পাবারই কথা। জ্বলন্ত ভাটার মতো দুটি চোখ, সেই চোখে বাসবদত্ত যে-কোনও মানুষের দিকে তাকিয়ে তার অন্তঃস্থলটা পর্যন্ত যেন দেখতে পান।

বাসবদত্তের সেবার জন্য রাজার তরফ থেকেই পাঁচটি সর্বগুণসম্পন্না সুন্দরী নিযুক্ত আছে। তারা বাসবদত্তকে স্নান করানো থেকে শুরু করে রাত্রে তার সুরাপানের সময় উৎকট সব খেয়াল চরিতার্থ করা পর্যন্ত সব কিছুই নিপুণ ভাবে পালনের জন্য প্রস্তুত।

সে-দিন সকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বাসবদত্তের চোখে রৌদ্র এসে পড়েনি বলে তার ঘুমও ভাঙল না। সেবিকারা দ্বারের পাশে প্রস্তুত, কিন্তু তাকে ডাকার সাহস কারুর নেই।

এদিকে নিচের তলায় অপেক্ষা-কক্ষটি রোগীতে ভরে গেছে। কিন্তু কেউ একটিও শব্দ করছেনা। এমনকি শিশুরা পর্যন্ত নীরব। সামান্য কোলাহল শুনলেই বাসবদত্ত সে-দিনের মতো চিকিৎসা বন্ধ করে দেন।

বাসবদত্তের আপনাআপনি ঘুম ভাঙল ঢের বেলায়। চোখ মেলেই তিনি হাঁক দিলেন, জল! জল!

এক জন সেবিকা রুপোর করকে ভরতি সুগন্ধ জল নিয়ে ঘরে ঢুকল সঙ্গে সঙ্গে। বাসবদত্ত হাত বাড়ালেন না, মুখটা হাঁ করে রইলেন। মেয়েটি তাঁর শিয়রের পাশে বসে খুব সাবধানে জল ঢেলে দিল মুখের মধ্যে, যেন বাইরে এক ফোঁটাও না পড়ে। বাসবদত্ত ঢক ঢক করে

সমস্ত জলটাই পান করলেন। এবার তিনি একটা হাত উঁচু করলেন। মেয়েটি বাসবদত্তের হাত ধরে টেনে তুলল প্রাণপণে। বাসবদত্ত তখনও চোখ খোলেননি। মুখে মৃদু মৃদু হাসি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আজ কে এসেছে আমায় তুলতে? স্পর্শ থেকে মনে হচ্ছে মেঘমালা। তাই না? তারপর উঠে বসে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন, মেঘমালা, তোমার মুখখানি ম্লান কেন? আকাশে মেঘ করেছে বলে?

মেয়েটি হাসির চেষ্টা করে বলল, কই, না তো!

হ্যাঁ, চোখ মুখ ঠিক স্বাভাবিক নয়। কাছে এসো তো!

বাসবদত্ত মেয়েটির চোখের পাতা দুটো একটু টেনে দেখেই বললেন, তুমি যে বিছানায় শোও, দেখো গিয়ে সেই বিছানার চাঁদরে একটু একটু হলুদ দাগ হয়েছে কিনা। হবেই। তোমার যকৃতের পীড়া আসন্ন।

এইভাবে শুরু হল বাসবদত্তের প্রথম চিকিৎসা।

উঠে তিনি চোখ মুখ প্রক্ষালন করে প্রাতঃকৃত্য সারলেন। তারপর ধ্যানে বসলেন। লোকে বলে, ওই ধ্যানের শক্তিতেই তিনি ধন্বন্তরি।

ও-দিকে নিচে শত শত রোগী অধীর ভাবে অপেক্ষা করছে। তার মধ্যে বসে আছে সুরপতি। বেলা অনেক বেড়ে যাচ্ছে। ঘুম থেকে উঠে ধ্রুবকুমার বাবাকে না দেখতে পেয়ে হয়তো কান্নাকাটি করবে, সুভদ্রা কোনও কথা বলবেনা, সব মিলিয়ে একটা জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে, সেদিকে তার খেয়াল নেই।

একসময় বাসবদত্ত নিচে নামলেন। সকলে সসমে উঠেপাড়াল তাকে দেখে। বাসবদত্তের অঙ্গে ঝকঝকেলাল মখমলের পোশাক। মাথায় উষ্ণীষ। যেন তিনি চিকিৎসক নন, একজন রাজা-মহারাজা। তার কণ্ঠস্বর মেঘমন্দ্র। এখানে রোগীদের মধ্যে কোনও অগ্রাধিকার নেই। বাসবদত্তের যাকে খুশি তাকেই আগে ডাকবেন।

সুরপতি একটু নিরাশ হয়ে গেল। এখানে রোগীরা সবাই নিজেরাই এসেছে। বাসবদত্ত রাজবৈদ্য, তিনি সম্ভবত রাজার বাড়ি ছাড়া আর কোনো রোগীর বাড়িতে যান না। সুভদ্রাকে নিয়ে আসা উচিত ছিল।

সুরপতি বিদেশি মানুষ, বাসবদত্তকে অনুনয়-বিনয় করে বুঝিয়ে বললে কি তার দয়া হবে না? বাসবদত্তকে দেখলে বেশ দয়ালু বলে মনে হয়। কিন্তু সবেমাত্র তিনি একজনের রোগ নির্ণয় করেছেন, এমন সময় ঘর্ঘর শব্দে রাজার রথ এসে থামল গৃহের সামনে। তার থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে রাজদূত দৌড়ে এসে ভেতরে ঢুকল, সসম্ভ্রম বাসবদত্তকে অভিবাদন করে বলল, রাজা আপনাকে এখুনি একবার স্মরণ করেছেন।

বাসবদত্ত হেসে বললেন, রাজার পিঠের ডান দিকে একটা ব্যথা উঠেছে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

জানতাম।

বাসবদত্ত উঠে দাঁড়িয়ে অপেক্ষমান রোগীদের মুখগুলো একবার দেখে নিলেন। একেবারে মুমূর্ষ কেউ আছে কি না সেটা দেখাই উদ্দেশ্য। তারপর সকলের উদ্দেশে বললেন, তোমরা একটু অপেক্ষা করো। আমি রাজাকে দেখে আসছি, আমার বেশি সময় লাগবে না। তোমরা কেউ যেও না।

এ-রকম নিয়ম আছে যে, সকাল থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বাসবদত্ত কোনও রোগীকেই ফেরান না।

বাসবদত্তকে দেখে সুরপতির কেশ শ্রদ্ধা ও ভরসা হল। তার দৃঢ় বিশ্বাস হল, ইনি সুভদ্রাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলতে পারবেন। সুতরাং সে অপেক্ষা করাই মনস্থ করল। এখান থেকে সরাইখানাটি বেশ দুরে, সেখানে গিয়ে আবার ফিরে আসতে অনেকসময় লাগবে। তার

চেয়ে বরং যে-কোনও প্রকারেই হোক একেবারে বাসবদত্তকে সঙ্গে করে নিয়ে ফেরাই ভাল।

কক্ষের মধ্যে বসে না থেকে সুরপতি বাইরের পথে পায়চারি করতে লাগল। বাসবদত্তের গৃহের চারপাশে ঘেরা একটি বিশাল উদ্যান। তাতে অদ্ভুত অচেনা সবনানা রকমে লতাবিতান ও গাছপালা। উদ্যানের সবকটি দ্বারেই 'প্রবেশ নিষেধ' লেখা। হয়তো এই সব গাছপালা থেকেই বাসবদত্ত ওষুধ সংগ্রহ করেন।

গৃহের বিপরীত দিকে একটি প্রশস্ত প্রান্তর সবুজ তৃণে ঢাকা। তার ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সুরপতি অল্প দূরেই একটি নদী দেখতে পেল। নদীটির দু'তীরে বড় বড় গাছের সারি, শান্ত, নির্জন, বড় মনোরম জায়গাটি। সেদিকে তাকিয়ে সুরপতির চোখ জুড়িয়ে গেল। ধনরাজ ঠিক কথাই বলেছিল, দারুকেশ্বর স্থানটি খুব সুন্দরই বটে। তবে সন্ধ্যার পর এখানকার সবাই প্রায় সুরাপানে উন্মত্ত হয়ে থাকে, এ বড় আশ্চর্য কথা।

একটা পাথরখণ্ডের ওপর বসে সুরপতি একটা গাছে হেলান দিল। এবং অল্পক্ষণের মধ্যে নিজের অজ্ঞাতসারেই ঘুমিয়ে পড়ল। গত কালের রাত্রি জাগরণ, দুশ্চিন্তা এবং মানসিক যন্ত্রণায় তার সমস্ত শরীরের শিরা-উপশিরাগুলি পর্যন্ত ক্লান্ত হয়েছিল, এই সময় ঘুমের মতো আরামদায়ক আর কিছু নেই। সুরপতি ডুবে গেল গভীর ঘুমে।

সে কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল জানে না, ঘুম ভাঙল একটা যন্ত্রণাবোধে। কে যেন তার চুলের মুঠি ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করছে।

সুরপতি চোখ মেলে দেখল চার-পাঁচ জন ধামাকা লোক ঘিরে ধরেছে তাকে। তাদের অঙ্গে প্রহরীর বেশ। একজন তার চুলের মুঠি ধরে টানছে আর চেঁচিয়ে বলছে, এবার পেয়েছি পাপিষ্ঠটাকে। কম ঘুরিয়েছে আমাদের।

সুরপতি যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল, এ কী! এক জন লোক দুম করে তার চোখর ওপর ঘুষি মারল।

আমাকে মারছে কেন? আমি বিদেশি।

বিদেশি! হারামজাদা বংশীলাল তুই আমাদের চোখে কম ধুলো দিয়েছিস?

কে বংশীলাল? শোনো শোনো, তোমরা আমাকে মেরো না।

ওরা সবাই মিলে সুরপতিকে ঘুষি আর চড়চাপড় মারতে লাগল। সুরপতি প্রাণপণে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে কাতর ভাবে বলতে লাগল, মেরো না, মেরে না, আমার একটা কথা শোনো আমি বংশীলাল নই, আমার বউ-ছেলে আছে, আমাকে ছেড়ে দাও।

ওরা কোনও কথায় কান দিল না। মেরেই চলল। সেই অবস্থাতেও সুরপতির মনে হল, এরা যদি তাকে হত্যা করে, তাহলে সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারের কী হবে?

সুরপতি কোনও ক্রমে ওদের হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু বেশি দূর যেতে পারল না, ওরা ক্ষিপ্রবেগে ছুটে এসে ধরে ফেলল এবং এক ধাক্কায় তাকে মাটিতে ফেলে চেপে বসল তার বুকের ওপর। সুরপতি বুঝল, তার আর নিস্তার নেই।

সে বলল, আমার যা অর্থ আছে সব তোমরা নাও, আমাকে শুধু ছেড়ে দাও। আমার ছোট ছেলে আছে, স্ত্রী আছে, আমি ছাড়া তারা–।

এক জন তার লগুড় দিয়ে সুরপতির মাথায় এমন প্রচণ্ড আঘাত করল যে, সুরপতি জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল মাটিতে। এক দিন আগেই তার মাথায় বড় চোট লেগেছিল, এখন সেখান থেকেও রক্ত বেরুতে লাগল গল গল করে।

লোকগুলো সুরপতির কোমর থেকে অর্থের পুটুলিটা বার করে তৎক্ষণাৎসব কটি সিক্কা টাকা ভাগ করে নিল নিজেদের মধ্যে। তারপর সুরপতির পা দুটো ধরে ছ্যাচড়াতে ছ্যাচড়াতে টেনে নিয়ে চলল।

গাছেরওপরে একটা কাঠবিড়ালি আরপাশের ঝোপেদুটো গিরগিট দেখছিল এইদৃশ্য। কাঠবিড়ালিটা ভয় পেয়ে গাছের ডগায় উঠে গেল আর গিরগিটি দুটো বেরিয়ে এসে পাথরের ওপর পড়ে থাকা সুরপতির টাটকা রক্ত চাটতে লাগল লকলকে জিভে।

প্রহরীরা সুরপতির দেহটা টানতে টানতে ঘাসভরা প্রান্তরটা পার হয়ে এসে পথের ওপর দাঁড় করানো একটি শকটের মধ্যে ছুঁড়ে দিল। কয়েক জন পথচারী দেখল সেই দৃশ্য। কেউ কোনও মন্তব্য করল না। এ রাজ্যে এ-রকম প্রায়ই হয়। তস্কর দস্যুরা প্রহরীদের চোখ ফঁকি দিয়ে বেশি দিন পলাতক থাকতে পারবে না, ধরা পড়বেই। প্রহরীদের ওপর কেউ কথা বলতে পারবে না। এ রাজ্যের প্রহরীরা প্রকাশ্য রাজপথেই যখন তখন যার তার মুণ্ড কেটে ফেলে।

প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে সুরপতির প্রাণ হয়তো তখুনি বেরিয়ে যেত। কিন্তু দৈবাৎ সেই সময়েই বাসবদত্ত ফিরলেন রাজপ্রাসাদ থেকে। এবং সুরপতির দিকের চোখ পড়ল। অসাধারণ তাঁর স্মৃতিশক্তি। তিনি সুরপতিকে দেখেই চিনতে পারলেন। এবং প্রহরীদের তিনি ভয় পান না। প্রহরীরাও রাজপ্রাসাদের বাইরে একমাত্র বাসবদত্তকেই সম্ভ্রম করে।

তিনি প্রহরীদের জিজ্ঞেস করলেন, একে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? এ তো আমার রোগী, একটু আগে আমি একে দেখে গিয়েছি।

প্রহরীরা বলল, প্রভু, এই বংশীলাল একজন বিখ্যাত তঞ্চক। নদীর ধারে লুকিয়েছিল। আমাদের বাধা দিতে এসেছিল বলেই আমরা একে প্রহার করেছি। এর নামে পরোয়ানা আছে, একে কারাগারে নিয়ে যাচ্ছি।

কিন্তু কারাগার পর্যন্ত এ পৌঁছবে না। তার আগেই শেষ হয়ে যাবে।

প্রভু, আমরা তো সেকথা জানি না। আমরা দায়িত্ব পালন করছি মাত্র।

তোমাদের অপরাধীকে তোমরা নিয়ে যাবে, তা ঠিক কথা। কিন্তু আমার বাড়ি থেকে তো কোনও রোগীকে আমি বিনা চিকিৎসায় ফিরিয়ে দিই না। এই লোকটি আমার বাড়িতে চিকিৎসার জন্য এসেছিল। সুতরাং একটু অপেক্ষা করো। আমি এর চিকিৎসা সেরে নিই।

রাজবৈদ্য বাসবদত্তের মুখের ওপর কথা বলার সাহস কারুর নেই। বাসবদত্ত তাঁর দুজন সহকারীকে ডেকে সুরপতির মাথার রক্ত মুছিয়ে দিলেন। খানিকটা মলম লাগিয়ে বেঁধে দিলেন ক্ষতস্থান। তারপর অজ্ঞান সুরপতির ঠোঁট জোর করে ফাঁক করিয়ে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন চারটি বিভিন্ন বটিকা।

বাসবদত্ত বললেন, এবার যাও। এরপর লোকটি বাঁচবে কিনা সেটা ওর নিয়তি।

প্রহরীরা শকট চালিয়ে দিল। এবং অবিলম্বেই কারাগারে পৌঁছে সুরপতির অচৈতন্য শরীর একটি নির্জন কক্ষে নিক্ষেপ করল।

.

সুরপতির জ্ঞান ফিরল পরদিন সকালে বাসবদত্তের চিকিৎসার গুণে তার শরীরের ব্যথা-বিষ অনেক কমে গেছে। সে ধড়মড় করে উঠে বসতে গেল। কিন্তু পারল না, শরীর অসম্ভব দুর্বল।

প্রায় অন্ধকার কারাগার, দেয়ালের একটা ঘুলঘুলি দিয়ে সামান্য আলো এসে পড়েছে। সুরপতি অনেকক্ষণ পর্যন্ত বুঝতেই পারল না সে কোথায় আছে এবং এখানে কী করেই-বা এল! তারপর ভাবল, সব জিনিসটাই বুঝি দুঃস্বপ্ন। সে নিশ্চয়ই এখনও বল্লারপুরের কাছে সেই জঙ্গলে একটা গাছের নিচে শুয়ে আছে। পাশে রয়েছে তার স্ত্রী ও পুত্র। অদূরে বণিকের দল। একটা নরম হাতের স্পর্শ লাগল তার মাথায়। সুরপতি চমকে উঠে বলল, কে?

একটি সুমিষ্ট নারীকণ্ঠ বলল, আপনি উঠবেন না, আপনি ঘুমোন সুরপতি আরও চমকে উঠল। এ কার কণ্ঠস্বর? এ কি সুভদ্রা?

সে চিৎকার করতে গেল, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর বেরুল না। সে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, তুমি–তুমি সুভদ্রা? তুমি কোথায়?

এই তো আমি।

সুভদ্রা, তুমি কথা বলতে পারছ? তোমার অসুখ সেরে গেছে?

আমার তো কিছু হয়নি।

ধ্রুবকুমার কোথায়?

এই তো, কাছেই রয়েছে।

সুরপতি একটা বিরাট নিশ্বাস ফেলল। আঃ কী শান্তি! সুভদ্রা তার সেবা করছে, ধ্রুবকুমার তার কাছেই আছে। এ চেয়ে আর বেশি কী চাই? সুরপতি নিশ্চিন্তে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

একটু বাদে সুরপতির ফের ঘুম ভাঙল। সে ডাকল, সুভদ্রা? সুভদ্রা তুমি কোথায়?

সুভদ্রা বলল, এই তত আমি।

সুরপতি হাত বাড়িয়ে সুভদ্রার নরম হাতটা স্পর্শ করল। তাই তো, সুভদ্রা তো সত্যিই এখানে রয়েছে। তা কী করে হয়? তার একটু একটু মনে পড়ছে, সে গিয়েছিল রাজবৈদ্য বাসবদত্তর কাছে, তারপর কয়েক জন লোক তাকে খুব মারল, মেরে মেরে একেবারে অজ্ঞান করে ফেলল। তারপর–তারপর সে সুভদ্রার কাছে চলে এল কী করে? এ জায়গাটা কোথায়?

সে জিজ্ঞাসা করল, সুভদ্রা, আমরা কোথায় এসেছি?

সুভদ্রা বলল, আপনি কথা বলবেন না, আপনি ঘুমোন।

সুরপতি আর ভাবতে পারছে না। বেশি চিন্তা করলে তার মাথা ঝিম ঝিম করছে। এখনও বুঝি রক্ত পড়ছে মাথা দিয়ে। সে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, সুভদ্রা, ওরা আমাকে খুব মেরেছে, সাংঘাতিক মেরেছে, ওরা নিষ্ঠুর, আমি কোনও দোষ করিনি।

কাঁদতে কাঁদতেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

আবার এক সময় সে জেগে উঠল। এখন তার পাশে কেউ নেই। সে উঠে বসল অতিকষ্টে।

সে চিৎকার করে ডাকল, সুভদ্রা, সুভদ্রা!

কেউ সাড়া দিল না।

সে অন্ধকারের মধ্যে চতুর্দিকে হাতড়িয়ে দেখল। কেউ নেই। কঠিন পাথরের ভূমি। সুরপতি নিজের গায়ে জোরে চিমটি কাটল, তাতে যদি ঘুমের ঘোর ভাঙে।

একটু আগে যে সে সুভদ্রার সঙ্গে কথা বলছিল। সুভদ্রার হাতের স্পর্শ লেগেছিল তার মাথায়। সে তো স্বপ্ন নয়!

তাহলে এখনই সে স্বপ্ন দেখছে। সে চেষ্টা করেও জেগে উঠতে পারছে না। না না, তাকে জেগে উঠতেই হবে। সে সুভদ্রার স্বামী, ধ্রুবকুমাবের পিতা, তার কি এত বেশিক্ষণ ঘুমিয়ে থাকলে চলে?

সে আরও জোরে চিমটি কাটল নিজের মুখে। খুব ব্যথা লাগল। এবার সে জেগে উঠেছে। এই তো সে বসে আছে। হাত বাড়ালে পাথর ছোঁওয়া যায়।

সে আবার ডাকল, সুভদ্রা, সুভদ্রা!

কেউ সাড়া দিল না।

সুভদ্রা গেল কোথায়? তাকে এখানে একা ফেলে?

সে ডাকল, ধ্রুব! বাছা ধ্রুবকুমার।

তা-ও কোনও সাড়াশব্দ নেই।

সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমার দু’ জনেই তাকে ফেলে অন্য কোথাও চলে গেছে? তাকে এই রকম অসুস্থ অবস্থায় রেখে?

সুরপতি মাথায় হাত দিয়ে দেখল, চুলের মধ্যে চাপ বেঁধে আছে রক্ত।

না, ওদের খুঁজে বার করতেই হবে। এ-রকম ভাবে বসে থাকলে তো চলবে না।

সুরপতি উঠে দাঁড়িয়ে দুর্বল পায়ে একটু চলার চেষ্টা করতেই একটা কঠিন জিনিসে আঘাত লাগল। একটা দেয়াল। সুরপতি আবার অন্য দিকে ঘুরে চলার চেষ্টা করল, সেদিকেও দেয়াল। নিরেট পাথরের। এটা কোন জায়গা? সুরপতি বেশি ভাবতে পারে না; তার মাথা অবশ হয়ে আসে। সে বসে পড়ল। একটু দূরে কীসের যেন শব্দ। একটু দূরে কারা যেন একটা শিকল নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। এখনও কি সে স্বপ্নের মধ্যে আছে?

এক সময় সে বুঝতে পারল, এটা স্বপ্ন নয়। অতি রূঢ় বাস্তব। সেএকা একটি ঘরে বন্দি।

সে দরজায় দুম দুম করে আঘাত করতে করতে বলল, কে আছ? বাইরে কে আছ? দরজা খুলে দাও।

একসময় ওপাশ থেকে একটা গম্ভীর গলা শোনা গেল, এই চুপ।

দরজা খুলে দাও আমার স্ত্রী, আমার ছেলে কোথায়? আমাকে না পেয়ে এতক্ষণ তারা কী করছে কে জানে।

চুপ করে থাকো।

সুরপতি তবু পাগলের মতো চিৎকার করতে লাগল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমকে ছেড়ে দাও।

বহুক্ষণ চিৎকারে সুরপতির কণ্ঠস্বর ভগ্ন হয়ে গেল। দ্বারের গায়ে হেলান দিয়ে সে বসে রইল। এখনও সে সবকিছু বিশ্বাস করতে পারছে না। কোনও মানুষের দুর্ভাগ্য কি এমন দলবদ্ধ হয়ে আসে? সপ্তগ্রামে তাদের বাড়ির মানুষজন এক এক করে মরে গেল। তাদের পুরুষানুক্রমিক ব্যবসা আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেল। বণিকদলের সঙ্গে দেশান্তরে যাচ্ছিল, সেখানেও পথের মধ্যে পড়ল দস্যুদলের হাতে। সুভদ্রার বাকশক্তি নষ্ট হয়ে গেল, তারপর আবার তাকে বংশীলাল ভেবে অত্যাচার করল কয়েকটি লোক। এখন সে কারাগারে আবদ্ধ। সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমার কী করছে কে জানে। মাঝখানে স্বপ্নের মধ্যে সুভদ্রা ফিরে এসেছিল। স্নেহকোমল হাতে সেবা করেছিল তার। সেই স্বপ্নের কথা ভেবে সুরপতির কষ্ট আরও দ্বিগুণ হয়ে গেল।

সুরপতি আর চিন্তা করতে পারল না, জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল আবার। তিন দিন পর সুরপতিকে নিয়ে আসা হল বিচারালয়ে। সুরপতির তখন অধোন্মাদের মতো দশা। সে দ্বারপথ থেকেই চিৎকার করতে লাগল, আমি বংশীলাল নই, আমি বংশীলাল নই, ঈশ্বর জানেন, আমি বংশীলালকে সাত জন্মেও দেখিনি।

বিচারক বললেন, এক!

সুরপতি ছুটতে ছুটতে বিচারকের পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ে বলল, ধর্মাবতার, আমি এক ভাগ্যহীন বিদেশি। এরা ভুল করে আমাকে ধরে এনেছে।

বিচারক বললেন, দুই!

সুরপতি বিলাপ করে বলল, আপনি আমার প্রতি দয়া করুন। আমার স্ত্রী-পুত্র না খেয়ে আছে।

বিচারক বললেন, তিন!

সুরপতি আবার কিছু বলতে যেতেই বিচারক হাত তুলে ইঙ্গিত করলেন। অমনি দুটি ভূমিকায় রক্ষী দু' দিক থেকে এসে সুরপতিকে চেপে ধরল। সুরপতির হাত-পায়ে শৃঙ্খল পরিয়ে তার মুখটাও বেঁধে দেওয়া হল কালো কাপড়ে।

বিচারক বললেন, অযাচিতভাবে এখানে কোনও কথা বলা যায় না। তুমি এ সভার নিয়ম তিনবার ভঙ্গ করেছ। তোমাকে আর কোনও কথা বলার সুযোগ দেওয়া হবে না।

সুরপতি মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগল।

পর পর দুজন সাক্ষ্য দিল যে সুরপতিই বংশীলাল। এ সম্পর্কেকারুর মনে কোনও সন্দেহ নেই। সেই চোখ, সেই নাক, সেই কপাল।

বংশীলালের বিরুদ্ধে অভিযোগ চুরি, তঞ্চকতা ও নারীর সতীত্ব নাশের। এ পর্যন্ত সাতাশ জন বিবাহিতা রমণীর ধর্মনাশ সে করেছে, তা জানা যায়। আরও কত এরকম ঘটনা অজানা রয়ে গেছে, তা কে জানে! শ্রেষ্ঠী বিনয় পালের স্ত্রীর সতীত্বনাশ করার জন্য সেই রমণী মাত্র সাত দিন আগে আত্মঘাতিনী হয়েছে।

অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর। সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ পেয়ে বিচারক ফাঁসির আদেশ দিলেন। সেদিন আরও অনেকগুলি আসামির বিচার করতে হবে, তাই তিনি আর বেশি সময় নষ্ট করলেন না।

রক্ষীরা সুরপতিকে ঠেলতে ঠেলতে আবার নিয়ে গেল কারাগারে। সুরপতি আর একটিও শব্দ উচ্চারণ করল না। সে বুঝতে পেরেছে, ভাগ্যলক্ষ্মী তাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছে। এখন মৃত্যুই তার নিয়তি। সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারকে সে আর ইহজীবনে কখনও চোখে দেখবে না।

দারুকেশ্বর কারাগারে তখন একত্রিশ জন ফাঁসির আসামি জমে আছে। প্রতি দিন তিন জনের বেশি ফঁসি হয় না। এই রকমই প্রথা। তাই সুরপতিকে আরও দশ দিন জীবন্মৃত অবস্থায় কাটাতে হল। এই কদিন তার মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশা ছিল, হয়তো খবর পেয়ে সুভদ্রা ছুটে আসবে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য। সুভদ্রা সকলের ভুল ভেঙে দেবে যে, সে বংশীলাল নয়, সে সপ্তগ্রামের শ্রেষ্ঠী সুরপতি। তার পরই মনে পড়েছিল, সুভদ্রা তো কথা বলতে পারে না। খবর পেলেও এ-সবকথা সে লোককে জানাবে কী করে? ধ্রুবকুমার তো আছে! বালকধ্রুবকুমার যথেষ্ট বুদ্ধিমান, সে-ই লোকসমক্ষে পিতৃপরিচয় দিতে পারে।

কিন্তু কেউ এল না সুরপতির খোঁজ করতে।

এই কারাগারের ব্যবস্থা এমন নিচ্ছিদ্র যে, বাইরে কোনও খবর পাঠাবার কোনও উপায় নেই। ভয়াল চেহারার প্রহরীরা ডাণ্ডা হাতে নিয়ে ঘোরে। সুরপতি চিৎকার করে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেই তারা ডাণ্ডা তুলে মাথায় মারতে আসে।

দ্বিপ্রহরে শুধু একজন শীর্ণকায় লোক আসে সুরপতিকে আহার্য দিয়ে যেতে। এক টুকরো পোড়া মাংস ও তিনখানি যবের রুটি। সেগুলি দলা পাকিয়ে গরাদের ফাঁক দিয়ে ছুঁড়ে দেয়। একদিন সুরপতি সেই লোকটির হাত চেপে ধরে বলল, ভাই ঈশ্বরের দোহাই, তুমি বলভদ্রের সরাইখানায় গিয়ে একটি বার খবর দাও। সেখানে আমার স্ত্রী ও পুত্র আছে। আমি বংশীলাল নই, আমি সুরপতি। আমি মরি তাতে ক্ষতি নেই, তবু ওরা যেন একবার খবর পায়। আর যদি আমি এখান থেকে কোনও ক্রমে ছাড়া পাই, তাহলে আগামী দশ বছর আমি যা উপার্জন করব, সবই তোমাকে দেব। ভাই দয়া করো, ঈশ্বরের দোহাই, এই সামান্য দয়া করে আমাকে।

লোকটি স্থিরভাবে চেয়েছিল সুরপতির দিকে। সুরপতির কথা শেষ হলে সে হাঁ করল। তার মুখের মধ্যে জিভ নেই। জিভটা সম্পূর্ণকাটা। কথা বলার কোনও ক্ষমতাই লোকটির নেই। ভয় পেয়ে সুরপতি তার হাত ছেড়ে দিল।

এগারো দিনের দিন সুরপতিকে নিয়ে যাওয়া হল বধ্যভূমিতে। জল্লাদ ফাঁসির দড়িটি ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করে দেখছে। সুরপতির হাত বাঁধা কিন্তু চোখ-মুখ খোলা।

একজন কারারক্ষী এসে তাকে প্রশ্ন করল, বন্দি, তোমার কোনও শেষ ইচ্ছা আছে?

সুরপতি মাথা নেড়ে বলল, না। তোমার মৃতদেহ কি দাহ করা হবে না নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হবে?

সুরপতি একটুক্ষণ চিন্তা করে বলল, বলভদ্রের যে সরাইখানা আছে, তার সামনে আমার মৃতদেহটা ফেলে রেখে এসো।

এমন সময় দুর থেকে এক জন অশ্বারোহী তীরবেগে ছুটে এল। সুরপতিকে তখন বধ্যমঞ্চে তোলা হয়েছে, অশ্বারোহী চিৎকার করে বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও।

অশ্বারোহী এসে বলল, আজ সকালেই রাজার একটি পুত্রসন্তান হয়েছে, সেই উপলক্ষে রাজা এক জন ফাঁসির আসামির শাস্তি মকুব করতে চান। এ রাজ্যে সেটাই প্রথা।

সেদিন সুরপতি ছাড়া আর কোনও ফাঁসির আসামি ছিল না। সুরপতি বুকের মধ্যে একটা আনন্দের গোরা লাফিয়ে উঠল। সে জল্লাদের হাত ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে আনন্দে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, আ-আ-হা-হা- আ আ।

সুরপতি ভাবল, নিয়তি তার ওপর তাহলে একেবারে বিরূপ নয়। ভাগ্যবলেই সে শেষ মুহূর্তে মুক্তি পেয়ে গেল। এখুনি সে ছুটে গিয়ে সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারকে দেখতে পাবে।

সেই বধ্যভূমির ওপর দাঁড়িয়ে সুরপতি উন্মাদের মতো নাচতে লাগল। তার দুচোখ দিয়ে মুক্তির আনন্দের অশ্রু গড়াচ্ছে।

কিন্তু নিয়তি আসলে সুরপতিকে নিয়ে একটা খেলা খেলছে। সেই খেলা এখনও শেষ হয়নি।

অশ্বারোহী রাজার সনদ তুলে দিল কারারক্ষীর হাতে। সে সেটা পাঠ করে সুরপতির দিকে তাকিয়ে বলল, যাক, খুব জোর বেঁচে গেলে বংশীলাল, তোমার মৃত্যুদণ্ড মকুব করে দশ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

একথা শুনে সুরপতির যতখানি নিরাশ হওয়ার কথা ছিল, ততখানি সে হল না। শুধু বেঁচে থাকারই যে একটা আনন্দ আছে, তা সে উপেক্ষা করতে পারল না।

এবার সুরপতিকে আনা হল অন্য একটি কারাগারে। কারাগারটি একটি পাহাড়ের পাদদেশে। এতে আছে সু-উচ্চ প্রাচীর ঘেরা একটি বিরাট চত্বর, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যাকালে বন্দিরা যথেচ্ছ ভ্রমণ করতে পারে। দ্বিপ্রহরে তাদের সকলকে সারিবদ্ধ হয়ে বসে পাথর ভাঙতে হয়। বড় বড় পাথরের চাঙড়কে তারা লৌহ হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো করে। দারুণ পরিশ্রমসাধ্য কাজ, মাথার ওপরে চড়া রোদ্দুরে শরীর থেকে গল গল করে স্বেদ বেরোয়, তবু এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেবার উপায় নেই, অমনি পিঠের ওপর এসে পড়বে কারারক্ষীর চাবুক।

রাত্রে তাদের শয়ন করতে হয় প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ছোট কুঠুরিতে। সেখানে আলো বাতাসের সম্পূর্ণ প্রবেশ নিষেধ। সেই ঘরে আছে বিরাট বিরাট আকারের মূষিক। কোন ছিদ্রপথ দিয়ে তারা ঢোকে তা বোঝাই যায় না। মূষিকের অত্যচারে রাত্রে ঘুমোয় কার সাধ্য। প্রায়ই কয়েদির গা থেকে ওই সব মূষিক মাংস খুবলে নিয়েছে এমন দেখা যায়। একজনের ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটাই মূষিকে কেটে নিয়েছিল।

সুরপতি সারা রাত ধরে তার হাতুড়িটা এ-দিক ওদিক চালিয়ে মূষিক নিধনের চেষ্টা করে। পাথরভাঙা হাতুড়িটা প্রত্যেক কয়েদির সঙ্গেই থাকে। কেউ কেউ রাগে দুঃখে যন্ত্রণায় সেই হাতুড়ি দিয়ে নিজের মাথাতেই এক ঘা মেরে বসে এক-এক দিন। তাতে কারারক্ষীরা একটুও বিচলিত হয় না। কয়েদির সংখ্যা কমলে তাদের কোনও দুঃখ নেই। কেউ তাদের কাছে কোনও কৈফিয়ৎ চায় না।

কিন্তু এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও সুরপতি তার মাথায় একদিনও সেই হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করেনি। সে বাঁচতে চায়।

৪. সুরপতির বৈচিত্র্যহীন কারাবাস

সুরপতির বৈচিত্র্যহীন কারাবাসের পঞ্চম বছরে একটা ঘটনা ঘটল।

কোনও ক্রমে চার বছর কাটিয়ে দেবার পর সে অনুভব করেছিল দশটা বছর সে কাটিয়ে দিতে পারবে ঠিকই। আবার সে মুক্তি পাবে। তারপর সুভদ্রা এবং ধ্রুবকুমার যদি বেঁচে থাকে তাহলে পৃথিবীর যে প্রান্তেই তারা থাকুক, সুরপতি ঠিক খুঁজে বার করবে তাদের।

দুর্গতির চরম সীমায় গিয়েও সুরপতি হেরে যায়নি। বেঁচে থাকার একটা অদ্ভুত জেদ আছে মানুষের। তার মাথায় ক্ষতস্থানটা সারতে দীর্ঘদিন লেগেছিল। হঠাৎ হঠাৎ যন্ত্রণা জেগে উঠত, তখন মনে হত, সে বুঝি পাগল হয়ে যাবে। সেই সময় মাঝে মাঝে সে নিজের পরিচয় ভুলে যেত। নির্জন কারাকক্ষে শুয়ে ব্যথায় ছটফট করতে করতে সে চিৎকার করে উঠত, আমি কে? আমি কোথায়? উত্তর দেবার কেউ নেই।

খানিকটা পরে যন্ত্রণা একটু কমে গেলে সে নিজেই ফিস ফিস করে নিজেকে শোনাত, আমি সুরপতি, আমাকে বাঁচতে হবে।

এই কারাগারের সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর কোনও যোগাযোগ নেই। বাইরের কোনও সংবাদই এখানে কেউ পায় না। সুরপতি জানে না সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারের ভাগ্যে কী ঘটেছে, তবু সে আশা করে, এক দিন না একদিন দেখা হবেই।

এই ক' বছরে সুরপতির শরীর অনেক সবল হয়েছে। কঠিন পরিশ্রমের ফলে তার প্রতিটি মাংসপেশী এখন সুদৃঢ়। তাছাড়া অসহ্য এই কারাজীবনকে কিছুটা সহনীয় করার জন্য সে কয়েকটি উপায় উদ্ভাবন করেছে।

যেমন পাথর ভাঙতে ভাঙতে সে এক দিন একটি চকমকি পাথর আবিষ্কার করে। কারুকে সেকথা না জানিয়ে সেই চকমকির দু'টি টুকরা সে নিজের কুঠুরিতে নিয়ে এসেছে। সেগুলি ঠুকলে বেশ বড় বড় ফুলকি বেরোয়, সেই আলোয় সম্পূর্ণ ঘরটা দেখা যায়। এর ফলে

তার মূষিক মারার অনেক সুবিধে হয়েছে। প্রতি রাতেই দুটি তিনটি করে মূষিক সে মারতে পারে। ইদানীং মূষিকরাও তাকে ভয় পেতে শুরু করেছে, তার কুঠুরিতে আর তারা সহজে আসে না।

চকমকির আলোয় সে কুঠুরির দেয়ালে একটা খড়িপাথর দিয়ে দিনের হিসেব রাখতে শুরু কবেছে। কত দিন, কত মাস, কত বছর পার হল তার হিসাব রাখতে পারবে এখন।

নানা রকম পাথরের টুকরো দিয়ে অস্ত্র বানাতেও শুরু করেছে। পাথরগুলি ভাঙবার সময় বিভিন্ন আকৃতির হয়। রক্ষীদের চোখের আড়ালে সে বিভিন্ন টুকরো নিয়ে ঘর্ষণ করে করে পাথরের ছুরি বানায়। একটি ছুড়ি রীতিমতো ধারালো ও মজবুত। সেটা ঠিক কোন ব্যবহারে লাগবে, তা সুরপতি এখনও জানে না, তবু নিজের কাছে সযত্নে লুক্কায়িত রেখেছে।

পাথরের টুকরো দিয়ে সে কখনও-সখনও নানা রকম পুতুলও বানায়। এ ব্যাপারেও তার সহজাত দক্ষতা আছে। একটিতে সে বানিয়েছে সুভদ্রার মুখ, আর একটিতে ধ্রুবকুমারের। মূর্তি দুটি তার ঘরের কোণে বসানো আছে। রক্ষীরা কোনও দিন কয়েদিদের দুর্গন্ধ কুঠরির মধ্যে ঢোকে না, তাই ওই মূর্তি দুটির কথা কেউ জানে না। প্রতি রাত্রে সুরপতি ওই মূর্তি দুটির সঙ্গে মনে মনে কথা বলে। এখন আর সে ততটা একা নয়।

এক-এক দিন রাত্রে বড় বিভ্রম ঘটে যায়। সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারের পাথরের মূর্তি দু’টি শিয়রের কাছে নিয়ে শুয়ে থাকে সুরপতি। মাঝ রাত্রে হঠাৎ কোনও শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে যায় তার। ধ্রুবকুমার যেন আকুল ভাবে ডাকছে, বাবা! বাবা! একেবারে সত্যিকারের কণ্ঠস্বর। সুরপতি আমূল চমকে ওঠে। সুরপতি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, ধ্রুব, ধ্রুব, বাছা, তুই কোথায়? অমনি সে একটি কচি বালকের হাতের স্পর্শ পায়। ধ্রুবকুমার বলে ওঠে, এই তো।

এ তো স্বপ্ন নয়! এ যে বাস্তবও। অন্ধকারের মধ্যে সুরপতি কিছু দেখতে না পেলেও শিশু ধ্রুবকুমারের স্পর্শ তো সে ঠিকই অনুভব করছে। তাহলে সুভদ্রা কোথায় সেকথা জিজ্ঞেস করতেই ধ্রুবকুমার বলে, মা তো আপনার পায়ের কাছেই বসে আছেন!

তাই তো। সুরপতি টের পায়, সুভদ্রা তার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে সুরপতির পা টিপে দিচ্ছে। তার সেই নরম উত্তপ্ত হাতের স্পর্শ চিনতে ভুল হয় না।

আনন্দে, বিস্ময়ে সুরপতির আবার মাথার যন্ত্রণা হতে শুরু করে। সে চেঁচিয়ে বলে, আমি কে? আমি কোথায়? সুভদ্রা, তুমি এত দিন কোথায় ছিলে?

সুভদ্রা মৃদুকণ্ঠে উত্তর দেয়, আপনার কষ্ট হচ্ছে, আপনি আর একটু ঘুমিয়ে নিন।

সুরপতি ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে বলে, আমার চেয়ে বেশি কষ্ট বুঝি এ পৃথিবীতে আর কেউ পায়নি। কেন আমার এ শাস্তি।

সে আবার ঘুমিয়ে পড়ে শ্রান্তিতে। কিছুতেই চোখ খুলে রাখতে পারে না। এক প্রহর বাদে যখন আবার চোখ মেলে, তখন হাত বাড়িয়ে আরবকুমার বা সুভদ্রাকে খুঁজে পায় না। শুধু দু'টি পাথরের মূর্তি। সেই কঠিন কারাগার।

এই কারাগার থেকে ক্কচিৎ দু-একটি কয়েদি মুক্তি পায়। আবার মাঝে মাঝে নতুন কয়েদিরাও আসে। কেউ মুক্তি পাবার দিন অন্য কয়েদিরা চোখের জলে তাকে বিদায় দেয়, যেন ঘনিষ্ঠ কোনও বান্ধব চলে যাচ্ছে। নতুন কয়েদিদের প্রথম প্রথম অন্যরা পছন্দ করে না। যেন তারা অন্য জাতের লোক, তাদের গায়ে অন্য রকম গন্‌ধ।

সুরপতির কারাজীবনের পঞ্চম বছরে এক দিন এক সঙ্গে সাত জন নতুন কয়েদি এল। তাদের মধ্যে এক জনকে দেখে সুরপতি তীব্রভাবে চমকে উঠল। উত্তেজনায় তার শরীরে রীতিমতো কম্পন শুরু হয়ে গেল। যদিও লোকটির একটি হাত দুর্বল হয়ে শুকনো গাছের

ডালের মতো ঝুলছে ও একটি চক্ষু নষ্ট, তবু তার বিশাল চেহারা ও বিরাট মুখখানা থেকে চিনতে অসুবিধা হয় না।

এ সেই দস্যু সর্দার বুধনাথ।

সুরপতির মনে হল, এই লোকটিই তার জীবনের সমস্ত দুঃখ দুর্দশার মূল। এ তার চোখের সামনে সুভদ্রার ওপর অত্যাচার করেছে, নির্দোষ ধনরাজকে হত্যা করিয়েছে। এর জন্যই সুভদ্রা মূক। সুভদ্রা যদি মূক না হত, তাহলে সুরপতি দারুকেশ্বরে থামত না, বংশীলাল বলে ভুল করে ধরাও পড়ত না।

সুরপতির সর্বাঙ্গে প্রতিশোধ প্রতিশোধ এই শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকল।

বুধনাথের সঙ্গে যে আর ছ'জন এসেছে, তারা ওরই দলের লোক। গৌড়বঙ্গে টুপিওয়ালা ইংরেজদের হাতে নাস্তানাবুদ হয়ে বুধনাথ তার দলবল নিয়ে পালিয়ে এসেছিল দারুকেশ্বরে। প্রথমে একটি সরাইখানায় আত্মগোপন করেছিল। সেখানেও একদিন এ রাজ্যের সৈন্যদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হয়। সেই সংঘর্ষে বুধনাথের একটি হাত ও চোখ নষ্ট হয়েছে।

এই সব কথা টুকরো টুকরো ভাবে সুরপতির কানে আসে। সরাইখানার কথা শুনেই তার বুক কেঁপে ওঠে। একি সেই বলভদ্রের সরাইখানা? তাহলে সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারের কোনও ক্ষতি হয়নি তো? যদিও, একটিও কানাকড়ি সম্বল না করে এই চার-পাঁচ বছর সুভদ্রা তার ছেলেকে নিয়ে সেই সরাইখানাতে যে থাকবে কী করে, সেকথাও তার মাথায় আসে না।

আরও খবর সংগ্রহের জন্য সুরপতি বুধনাথের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করে। এক-একসময় প্রচণ্ড রাগে তার ইচ্ছে হয়, তার হাতুড়ির এক ঘায়ে বুধনাথের খুলি ফাটিয়ে একেবারে ঘিলুবার করে দেয়। কিন্তু তাহলে বুধনাথের দলের লোকরা তাকে ছাড়বে না, তারাও তাকে হত্যা করবে সঙ্গে সঙ্গে। কয়েদখানার মধ্যে এ-রকম সংঘর্ষ হয় মাঝে মাঝে।

অকস্মাৎ বিবাদে মত্ত হয়ে সংঘর্ষে মেতে ওঠে কয়েদিরা। তিন-চার জন খুনোখুনি করে মরে। রক্ষীরা বাধা দেবার চেষ্টাও করে না। দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে। বন্দিদের প্রাণ সম্পর্কে যেন তাদের দায়িত্বই নেই। এরা যত কমে ততই মঙ্গল। সুরপতি এ-ভাবে মরতে চায় না।

বুধনাথ সুরপতিকে চিনতে পারেনি। চিনতে পারার কথাও নয়। সে কত জায়গায় দস্যুতা করেছে, কত মানুষের সর্বনাশ করেছে, সকলের মুখ সে মনে রাখবে কী করে? অত্যাচারিতরাই অত্যাচারীকে মনে রাখে।

কয়েক মাস কেটে যাবার পর সুরপতি বুঝতে পারল, বাকি জীবনটা কয়েদি হিসেবে কাটিয়ে দেবার মতো মানুষ বুধনাথ নয়। ইতিমধ্যেই সে পলায়নের ফন্দি আঁটছে। তখন সুরপতি সুকৌশলে বুধনাথের দলে ভিড়ে গেল। তার পাথরের তৈরি ছুরি দেখে খুশি হল বুধনাথ। এগুলি কাজে লাগবে। তাছাড়া বুধনাথের দলের প্রায় সকলেই এখন অল্প-বিস্তর অঙ্গহীন, শেষ যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। এখন সুরপতির মতো এক জন সবল স্বাস্থ্যবান লোকের সাহায্যের বিশেষ দরকার। বুধনাথ যখন শুনল যে, সুরপতির কাছে আগুন জ্বালাবার সরঞ্জাম আছে, তখন সেসব চেয়ে খুশি হয়ে উঠল। বন্ধুর মতো সেসুরপতির কাঁধে হাত রেখে বলল, তোমার ওপরেই আমাদের জীবন-মরণ নির্ভর করছে।

সুরপতির মনে হল, যেন কোনও নোংরা প্রাণী তার কাঁধের ওপর পিচ্ছিল হাত রেখেছে। তার ইচ্ছে হল, ঘৃণায় সে হাতটা ঠেলে সরিয়ে দেয়। এই হাত সুভদ্রাকে স্পর্শ করেছে, এই হাত সভুদ্রার শাড়ি খুলে নিয়েছে।

কিন্তু সুরপতি তখন বুধনাথের ওপর কোনও ক্রোধের ভাবই দেখাল না। সে বুঝে নিয়েছে, তাদের এখন পরস্পরের ওপর নির্ভর করতে হবে।

সে বিগলিত ভাবে হেসে বলল, আপনাকে যদি কোনও রকম সাহায্য করতে পারি, সে তো হবে আমার পরম সৌভাগ্য। তমলুক থেকে দারুকেশ্বর পর্যন্ত আপনার নাম জানে না কে?

বুধনাথ বলল, আবার আমার দিন আসবে। আবার আমি দল গড়ব। টুপিওয়ালা গোরাদের সঙ্গে সামনাসামনি লড়াই করে পারা যাবে না, ওদের কৌশলে শেষ করতে হবে।

একটু থেমে, হঠাৎ সুরপতির দাড়ি চেপে ধরে বলল, তোমার নাম বংশীলাল নয়?

সুরপতি বলল, না তো!

বুধনাথ হা-হা করে হেসে বলল, আমার কাছে লুকোতে পারবে না। যতই বড় বড় দাড়িগোঁফ রাখো, আমি ঠিক চিনেছি। বল্লারপুরে তুমি একবার আমার মুখোমুখি পড়েছিলে, মনে আছে? তুমি একটি গৃহস্থবাড়ির মেয়েকে নিয়ে পালাচ্ছিলে, হঠাৎ আমি দলবল নিয়ে এসে পড়ি, মনে নেই?

সুরপতি বুঝল, প্রতিবাদ করে লাভ নেই। তাই চুপ করে রইল।

বুধনাথ বলল, সেবার তুমি অতি কৌশলে আমার হাত ছাড়িয়ে পালিয়েছিলে। ছদ্মবেশ ধারণে তোমার জুড়ি নেই। তুমি প্রায় চোখের নিমেষে রূপ পালটে ফেলে এক সন্ন্যাসী সাজলে। আমারও চোখে ধন্ধ লেগে গেল। স্ত্রীলোকটিকে তুমি অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে রেখে গিয়েছিলে এক গাছতলায়। অবশ্য যাবার আগে তুমি তার গয়নাগাঁটি সব খুলে নিয়েছিলে। ধূর্তচুড়ামণি, এবার তোমাকে হাতের কাছে পেয়েছি! তোমার এই দাড়িও কি নকল নাকি?

বুধনাথ সুরপতিরদাড়ি ধরে টান দিল জোরে। প্রচণ্ড ব্যথা লাগলেও মুখ অবিকৃত রাখল সুরপতি। গম্ভীর স্বরে বলল, বুধনাথ, এখন তুমি আর আমি একই জায়গায় এসে ঠেকেছি। এখন আর শত্রুতা করে লাভ কী? হাত সরাও।

বুধনাথ বলল, তুমি একা একা কাজ সারতে, কখনও দল গড়োনি। একা কারবার চালাবার অবশ্য কিছু সুবিধে আছে, বিশেষত যদি মেয়েদের কারবার হয়। ধরা পড়লে কী করে?

এবার কোনও কথা না বলে সুরপতি নিজের কপালটা ছুঁয়ে দেখাল।

বুধনাথ বলল, ঠিক। নিয়তিকে এড়াবার কোনও উপায় নেই। যাই হোক, পুরনো কথা মনে রেখে আর লাভ নেই। আজ থেকে আমরা দোস্ত। হাতে হাত দাও।

সুরপতি সহাস্যে বুধনাথের ডান হাতটা চেপে ধরল। মনে মনে বলল, প্রথম সুযোগেই আমি তোমাকে খুন করব বুধনাথ। তোমাকে আমি ছাড়ব না।

সেই দিন থেকে বুধনাথ সব সময় সুরপতির কাছাকাছি থাকে, আর জেল ভেঙে পালাবার বুদ্ধি আঁটে। এক-একটা মতলবের ঠিক হয়, আবার নানা দিক চিন্তা করে সেটা বাতিল হয়ে যায়। বুধনাথের দলের লোকেরা অন্ধের মতো এখনও তার হুকুম মেনে চলে। অন্য কয়েদিদের মধ্য থেকে খুব বেছে বেছে আরও তিন জনকে দলে আনা হল। তবে এর মধ্যে সুরপতিই সব চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য, কারণ এখন সে যেমন সকলের চেয়ে বেশি বলশালী, তেমনি তার বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ। সেঠাণ্ডা মাথায় সব দিক ভেবে দেখতে পারে। সে আর আগের সেই নিরীহ বিনীত সুরপতি নেই।

বুধনাথ জীবনে কখনও কারুর হুকুম মেনে চলেনি তাই কারাগারের জীবন মানিয়ে চলা তার পক্ষে খুবই শক্ত হচ্ছিল। সে নানা রকম বিকৃত ভোগবিলাসে অভ্যস্ত, এরকম প্রতি দিনের পাথর-ভাঙা শ্রম তার সহ্য হয় না। সব চেয়ে অসহ্য হয় রক্ষীদের হুকুম মেনে চলা। কথায় কথায় সে দপ করে জ্বলে ওঠে।

একদিন এক রক্ষী প্রায় খেলাচ্ছলেই বুধনাথের পিঠে কশাঘাত করতেই বুধনাথ খেপে গিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর রক্ষীর হাত থেকে কশা কেড়ে নিয়ে সপাটে মারল তার মুখে। আরও কয়েক জন রক্ষী তার দিকে ছুঠে আসতেই সে এলোমলো ভাবে কশা চালাতে চালাতে ছুটল প্রধান দ্বারের দিকে।

দূর থেকে দেখেই সুরপতি বুঝল, বুধনাথের মস্তিষ্ক-বিভ্রম ঘটেছে। প্রধান দ্বারের কাছে বর্শাধারী প্রহরীরা রয়েছে, তারা নিমেষে বুধনাথের দেহ ফুঁড়ে ফেলবে। সুরপতি একটা

বড় পাথরের খণ্ড গড়িয়ে দিল বুধনাথের পায়ের দিকে। তাতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল বুধনাথ আর অমনি এক জন কশাধারী সৈনিকগিয়ে তার চুলের মুঠো ধরল। তারপর মারতে মারতে তাকে নিয়ে গেল কারাকক্ষের দিকে। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সুরপতি। প্রধান দ্বার পর্যন্ত পৌঁছলে বুধনাথ কিছুতেই প্রাণে বাঁচত না।

তারপর সুরপতি নিজেই বিস্মিত হল। সে কেন বুধনাথকে প্রাণে বাঁচাতে গেল? বুধনাথ তার চরমতম শত্রু! জেল থেকে পলায়নের সঙ্গী হিসেবে সে বুধনাথকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়? তাও নয়, কারণ পলায়নের সব ব্যবস্থা সে করে ফেলেছে, তাতে বুধনাথের সাহায্যের খুব বেশি প্রয়োজন নেই। তবে? সুরপতি বুধনাথকে সামান্য এক জন রক্ষীর হাতে নিহত হতে দিতে চায় না। তার সঙ্গে সুরপতির নিজস্ব বোঝাঁপড়া আছে।

তারপর এক দিন সন্ধের পর, কারাগারের মধ্যে মাঠের এক পাশে জেলরক্ষীদের ছাউনিতে আগুন লাগল। ছাউনির মধ্যে জেলরক্ষীদের স্ত্রী-পুত্রকন্যা থাকে, আগুন দেখে তারা দিশেহারা হয়ে গেল।

বন্দিদের তখন খাবার সময়, তাদের সারিবদ্ধ ভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল খাবার ঘরে, হঠাৎ সব কিছু বিপর্যস্ত হয়ে গেল। বন্দিরাও চেঁচিয়ে উঠলো, আগুন, আগুন। জল! জল।

যেন বন্দিরাও কারারক্ষীদের ছাউনিতে আগুন নেভাতে সাহায্য করতে চায়-এইভাবে তারা ছুটে গেল সে-দিকে। কিছু কিছু চেষ্টাও করলো আগুন নেভাবার। এবং সুরপতি ও বুধনাথ এরইমধ্যে আরও বেশি করে আগুন ছড়িয়েও দিতে লাগল। এক জন কারারক্ষী বুধনাথকে সেই অবস্থায় দেখে ফেলেছিল, বুধনাথ সবলে তাকে উঁচুতে তুলে ছুঁড়ে দিল আগুনের মধ্যে। তারপর নিজেই সে চেঁচিয়ে উঠল, বাঁচাও, বাঁচাও। মানুষ পুড়ছে।

বুধনাথ এবার অন্ধকারের মধ্যে তীক্ষ্ণ শিস দিতে দিতে উলটো দিকে দৌড়াল। তার দলের লোকেরাও চলে এল তার পিছু পিছু।

দড়ির মই আগে থেকেই তৈরি করে লুকিয়ে রাখা ছিল, ঝপাঝপ সেই মই বেয়ে সকলেই উঠে গেল প্রাচীরের ওপরে, তারপর উলটো দিকে লাফ দিল। প্রাচীরের এ-পারে কী আছে কেউ জানে না, অত উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়ায় কারুর হাত ভাঙল, কারুর পা ভাঙল, কিন্তু মুক্তির আনন্দে সবাই উল্লসিত।

সুরপতির মাথা ঠাণ্ডা, সে অমন ভাবে লাফাল না। সে প্রাচীরের ওপর উঠে সাবধানে চারপাশ চেয়ে দেখল। এখানে প্রাচীরের নিচে গড়ানে পাহাড়। সে দড়ির মইটা গুটিয়ে নিয়ে প্রাচীরের ওপর দিয়েই সাবধানে হাঁটতে লাগল।

বুধনাথ তাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছ?

সুরপতি গম্ভীর ভাবে বলল, এসো আমার সঙ্গে।

তারপর একটা সুবিধা মতো জায়গা দেখে মই লাগিয়ে সুরপতি শেষবার কারাগারের ভেতরটা দেখে নিল। আগুনের শিখা এখন লক লক করছে সারা ছাউনি জুড়ে। এদিকে এখন কেউ আসবে না। বুধনাথ ও সুরপতি নেমে পড়ল উলটো দিকে।

সুরপতি বলল, এবার চলল, সঙ্গীদের খোঁজে যাই।

বুধনাথ তার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলল, দুর নির্বোধ। ওদের খোঁজে গিয়ে কী হবে? ওইসব কানা খোঁড়াদের নিয়ে আমার কোনও কাজ হবে না। আমি দল গড়ব নতুন লোক নিয়ে। ওরা মরুক বাঁচুক, তাতে আমাদের কী? এসো আমরা পালাই।

সুরপতি বলল, ওরা তোমার এত দিনের সঙ্গী, তুমি ওদের খবর নেবে না?

বুধনাথ বলল, গোল্লায় যাক!

দুজনে অন্ধকারের মধ্যে ছুটল।

কারাগারটি তৈরি করা হয়েছিল বেছে বেছে একটা দুর্গম জায়গাতেই। এক দিকটা শুধু উঁচু-নিচু পাথর আর জঙ্গল, পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটা খরস্রোতা নদী। এই রাস্তায় দৌড়ানো খুব সহজ কাজ নয়। যে-কোনও মুহূর্তে রক্ষীরা বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে। একমাত্র উপায় নদীটা পার হওয়া।

সুরপতি নদীর জলে একটুখানি পা দিয়ে দেখল, অসম্ভব তেজি স্রোত, জলও তেমনি ঠাণ্ডা। এ নদী সাঁতরে পার হওয়া যাবে না। তখন তার অনুতাপ হল, কেন দড়ির মইটা ফেলে এসেছে। সেটা থাকলে গাছের ডালে বেঁধে একটা কিছু উপা করা যেত। কিন্তু এখন আর ফিরে গিয়ে নিয়ে আসার সময় নেই।

নদীর ধার ঘেঁষেই হাঁটতে লাগল ওরা। কিন্তু এভাবে বেশি দূর যাওয়া যাবে না। সামনেই খাড়া পাহাড়, এ পাহাড়ে উঠতে বহু সময় লেগে যাবে। তাছাড়া রক্ষীরা যদি ঘোড়া ছুটিয়ে আসে, তাহলে ধরে ফেলবে অনায়াসেই। সুরপতির মধ্যে বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছটফট করছে, সে আর কিছুতেই ধরা দেবে না। এক জায়গায় দেখল, নদীর ওপর একটা তালগাছ অনেকখানি হেলে আছে। সেটা প্রায় নদীর তিন-চতুর্থাংশ পেরিয়ে এসেছে, কিন্তু বাকিটা পেরুবার উপায় কী?

সুরপতি তবু বলল, বুধনাথ তুমি দাঁড়াও, দেখি আমি কোনও উপায় করতে পারি কি না।

সুরপতি তালগাছটার ওপরে উঠে গেল। একেবারে ডগার কাছে এসে দেখল, এখনও বেশ খানিকটা দূরে তীর। এখান থেকে লাফাবার কথা ভাবলেই গা ছম ছম করে।

বুধনাথ চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী, পার হওয়া যাবে?

সুরপতি বলল, না।

তবু সে তালগাছের ডালটা ধরে ঝুলে পড়ল। নিচে জলের স্রোত, ওর মধ্যে পড়ল আর বাঁচার আশা নেই। তা-ও সে অনেক কষ্টে নিজের শরীরটাকে দুলিয়ে তারপর হাত ছেড়ে দিল।

সুরপতি জলের মধ্যেই পড়ল, তবে তীরের অনেকটা কাছে। স্রোতে ভেসে যাবার আগেই সে হ্যাঁচোড় প্যাঁচোড় করে একটা গাছের শক্ত শিকড় ধরে ফেলল। তারপর ওপরে উঠে আসতে আর বিশেষ বেগ পেতে হল না।

ওপরে উঠে সে হাঁপাতে লাগল। সে নিশ্চিত মৃত্যুর কাছ থেকে ফিরে এসেছে। নদীটা যেন জীবন্ত, প্রবল শক্তিতে তাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছিল। একবার এই স্রোতের টানে পড়লে আর নিস্তার নেই।

বুধনাথ ও-পার থেকে সুরপতিকে লক্ষ্য করছিল। সুরপতি নির্বিঘ্নে পারে উঠে যাবার পর সে দুঃখিত ভাবে বলল, বংশীলাল, তুমি আমাকে ফেলে চলে গেলে?

সুরপতি বলল, তুমিও এসো।

বুধনাথ বলল, আমি ওভাবে পারব না। তুমি বেঁচে গেছ দৈবাৎ। দৈবতা আমার ওপর সদয় নাও হতে পারে!

সুরপতি বলল, তাহলে আর আমি কী করতে পারি বলো? আত্মরক্ষা মানুষের ধর্ম, আমিও আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছি মাত্র।

এই সময় দূরে কিছু কোলাহল শোনা গেল। তবে কি রক্ষীদল এই দিকেই আসছে? সুরপতি দেখল আর অপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সে প্রস্থানের উদ্যোগ করে বুধনাথের উদ্দেশে বলল, বিদায়।

বুধনাথ কাতর ভাবে বলল, যেও না! যেও না! আমি আসছি, তুমি আমাকে একটু সাহায্য করো। বুধনাথ তালগাছের ওপর উঠে এল। তার এক হাতে জোর নেই, তাই তাকে অতি

সাবধানে আসতে হয়। ডগার কাছে এসে সে খুব ভয় পেয়ে গেল। এখান থেকে লাফিয়ে পড়া খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু দূরের কোলাহলটা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। আর দেরি করার উপায় নেই।

সে-ও সুরপতির মতো ঝুলে পড়ল। কিন্তু এক হাতে সে শরীর দোলাতে পারছে না। তার বিশাল শরীরের ভার ওই এক হাতে ধরে রাখাও যাচ্ছে না। সে চিৎকার করে বলল, বংশীলাল আমাকে ধরো, আমি পারছি না।

সুরপতি জলের মধ্যে খানিকটা নেমে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়েও হাতটা গুটিয়ে নিল।

তারপর সে দৃঢ়স্বরে বলল, না। বুধনাথ, তুমি কোনও দিন কারুর সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়েছ? তবে আজ কেন নিজে সাহায্য চাইছ? এইমাত্র তুমি তোমার পুরনো সঙ্গীদের ফেলে এলে।

বুধনাথ আর্তনাদ করে বলল, বাঁচাও। আমি আর পারছি না। তুমি যা চাও, তাই দেব। আমার এখন অনেক ধনরত্ন লুকোনো আছে, তোমাকে সব দেব, বাঁচাও বংশীলাল।

সুরপতি বলল, আমার নাম বংশীলাল নয়। আমি সুরপতি। বল্লারপুরের কাছে জঙ্গলের মধ্যে তুমি আমার স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছিলে, আমারই চোখের সামনে।

বুধনাথ বলল, তুমি আমাকে একশো ঘা চাবুক মেরো, আমি তোমার ক্রীতদাস হয়ে থাকব, বাঁচাও, আমার হাত ছিঁড়ে যাচ্ছে।

সুরপতি বলল, কুকুর, তুই যার জীবন নষ্ট করে দিয়েছিস, তার কাছেই আজ আবার নিজের প্রাণভিক্ষা করছিস?

বুধনাথ বলল, তুমি আমার নাকটা কেটে দাও, কান দুটো কেটে নিও, তবু আমাকে বাঁচতে দাও, আমাকে শুধু প্রাণে বাঁচিয়ে রাখো।

আমার স্ত্রী বিষ খেয়ে মরতে চেয়েছিল, তুই তবু তাকে –

তুমি আমার চোখ দুটো অন্ধ করে দিও। আমার পুরুষত্ব নষ্ট করে দিও, তবু তুমি আমার প্রাণটা শুধু ভিক্ষে দাও, আমি আর পারছি না। আমার হাত ছিঁড়ে যাচ্ছে, পারছি না, বাঁচাও।

নিচের দিকে চেয়ে দেখ কুকুর! এই নদীর জল তোকে কামড়ে খেয়ে ফেলবার জন্য হাঁ করে আছে।

আমাকে বাঁচাও, আমার যা ধনরত্ন আছে, তাতে তোমার সাত পুরুষ সুখে থাকবে, সব তোমাকে দেব, আমি পথের ভিখির হয়ে থাকব।

ভিখারিরও হৃদয় আছে, তোর তা-ও নেই, তুই বেঁচে থাকার যোগ্য নোস।

অসম্ভব মনের জোর বুধনাথের, সে এখনও এক হাতে ধরে আছে গাছটা। যদি একবার শরীরটা দোলাতে পারে, তাহলেই এ-পারের দিকে এসে লাফিয়ে পড়বে। সেইটুকুই সে পারছে না। তার ভারি শরীর, তার একটা হাত অকেজো।

বুধনাথকে মারার জন্য সুরপতি নদীর কিনারা থেকে একটা বড় প্রস্তরখণ্ড তুলল, কিন্তু সেটা ছুঁড়ে মারার আগেই বুধনাথের হাত ছেড়ে গেল, সে ঝুপ করে গিয়ে পড়ল জলের মধ্যে।

বুধনাথ পায়ের তলায় মাটি পেল না। বিকট আঁ-আঁ শব্দ করে সে স্রোতে ভেসে যেতে লাগল। নদীর মধ্যে মাঝে মাঝে মাথা জাগিয়ে আছে বড় বড় পাথব। তারই কোনও একটাতেই মাথায় ধাক্কা লাগায় একটু বাদেই বুধনাথেব কণ্ঠস্বর থেমে গেল।

সুরপতি জল থেকে উঠে মাটির ওপর বসে পড়ল। উত্তেজনায় তার নাক দিয়ে বিরাট বিরাট দীর্ঘশ্বাস পড়ছে। চোখ দুটি যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তার শরীরে অসম্ভব ক্রোধ এসে গিয়েছিল। বুধনাথকে সে নিজের হাতে খুন করতে চেয়েছিল। শেষ

পর্যন্ত যে বুধনাথের রক্তে তারহাত রঞ্জিত হলনা। সেটা এক হিসেবে ভালই। তার প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে, কিন্তু বীভৎস কিছু করতে হয়নি। সে বুধনাথকে বাঁচার সুযোগ দেয়নি মাত্র, কিন্তু হত্যা তো করেনি!

সুরপতি খুবই ক্লান্ত বোধ করছিল। কিন্তু আর দেরি করার উপায় নেই। ও-পারে খানিকটা দূরে এখনও মশালের আলো দেখা যাচ্ছে। আবার সে উঠে দৌড়াতে দৌড়াতে বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

৫. তিথির পর তিথি

ক্রমে পার হয়ে গেল তিথির পর তিথি, মাসের পর মাস। সুরপতির কাছে কালের হিসাব নেই। তবু সে মনে মনে গণনা করে খানিকটা অনুমান করল যে, কারাগারের দিনগুলি সমেত প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর কেটে গেছে।

এর মধ্যে সে সুভদ্রা ও ধ্রুবকুমারের কোনও সংবাদই পায়নি। তারাও জানে না সুরপতির খবর। তারা বেঁচে আছে কি না কে জানে!

সহায়সম্বলহীন অবস্থায় কীভাবেই-বা বেঁচে থাকবে!

তবু সুরপতি কারাগার থেকে বেরিয়ে প্রথমেই দারুকেশ্বর গেল না। কারাজীবনের বিভীষিকার কথা সে ভুলতে পারে না। আবার সে কোনও ক্রমেই ধরা পড়তে চায় না। সে তো সুরপতি হিসেবে ধরা পড়েনি, সে ধরা পড়েছে বংশীলাল হিসেবে। বোঝা যায় বংশীলালের ওপর অনেকেরই অনেক রাগ আছে। সুতরাং জেলপলাতক বংশীলালের জন্য আবার খুব খোঁজাখুঁজি চলবেই।

সুরপতির মুখে এখন দাড়িগোঁফের জঙ্গল। সেগুলো সে ইচ্ছে করেই নির্মূল করল না। কারণ তার দাড়ি কামানো মুখের সঙ্গেই বংশীলালের মিল।

আন্দাজে দিকনির্ণয় করে সে চলতে লাগল দারুকেশ্বরের বিপরীত দিকে। প্রথম কিছুদিন রইল সে এক অরণ্যের মধ্যে লুকিয়ে। অতিকষ্টে ফলমূল সংগ্রহ করে ক্ষুধা মেটায়। ক্বচিৎ-দৈবাৎ কোনও মানুষজন দেখলেই সে ঝোঁপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে, যেন সে অরণ্যের এক ভীত অসহায় পশু। যে-কোনও মানুষকেই তার ভয়।

এইভাবেও কাটল কয়েক মাস। তারপর সুরপতি এক দিন সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। অরণ্যের জীবনে সে যেন বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, কোনও রকমে ক্ষুধানিবৃত্তি করতে পারলেই আর কোনও চিন্তা নেই, তারপর নিশ্চিন্তে নিদ্রা দেওয়া যায়। আর কোনও দায়িত্ব নেই,

আর কোনও ভয় নেই। এইভাবেই তার কাটবে নাকি সারা জীবন? সে সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারেব কোনও সন্ধান করবে না? সে এত স্বার্থপর?

এই উপলব্ধি হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে বেরিয়ে পড়ল অরণ্য থেকে। এখন আর তাকে দেখে কেউ সভ্য সমাজের মানুষ বলেই মনে করবে না, কে চিনতে পারবে তাকে? তবু সে সতর্ক হয়ে থাকে।

অরণ্য থেকে বেরিয়ে সে এমন এক রাজ্যে উপস্থিত হল, যেখানকার মানুষজনের পোশাক পরিচ্ছদ অন্য রকম, ভাষাও আলাদা। যাক, তাহলে এ রাজ্যে নিশ্চয়ই কেউ বংশীলালকে চেনে না!

সে অজানা গ্রামগঞ্জে ঘুরতে লাগল। তার পোশাক শতছিন্ন, শরীরে পুরু ময়লা, দাড়িগোঁফের মধ্যে কোটরগত চোখ, তাকে দেখায় ঠিক পথের পাগলের মতো। খিদের জ্বালায় সে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করে। যে-দিন ভিক্ষে ঠিকমতো পায় না, সে-দিন রাগে তার শরীর জ্বলে। তার এখন শক্তসমর্থ দেহ, প্রচুর খাদ্যে প্রযোজন, অনাহারের কষ্ট সে সহ্য করতে পারে না। এক-এক দিন সন্ধের দিকে তার ইচ্ছে হয়, পথের ধারে লুকিয়ে থেকে কোনও পথিকের মাথায় ডাণ্ডা মেরে তার যথাসর্বস্ব কেড়ে নেয়।

কিন্তু অতি কষ্টে সে নিজেকে দমন করে। সে পাপের পথে কিছুতেই যাবে না। একবার ও-পথে গেলে আর ফেরার উপায় নেই। তাহলে সে আর কোনও দিনই সুভদ্রা ও ধ্রুবকুমারের কাছে যেতে পারবে না। ওদের দুজনের কথা মনে পড়লেই তার চোখে জল আসে। সে তো জ্ঞানত কোনও অপরাধ করেনি, তবু এই দুর্ভাগ্যের মালা কে তার গলায় পরিয়ে দিল। নিয়তি? তাকে নিয়ে নিয়তির এই নিষ্ঠুর খেলা কেন?

সারা দিন ভিক্ষার পর যেটুকু খাদ্য সে পায়, তা নিয়ে সে কোনও নির্জন প্রান্তরের বৃক্ষতলায় বসে। যতটুকু খাদ্যই তার কাছে থাক, সে তার তিনভাগ করে। নিজে একভাগ খেয়ে, বাকি দু'ভাগ রাখে সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারের নামে। ক্ষুধায় তার পেট জ্বলে, তবু

সে নিজের স্ত্রী-পুত্রকে ভাগ না দিয়ে খাবে না। এইভাবে সে সুভদ্রা ও ধ্রুবকুমারের কথা মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখে।

রাত্রিবেলা সে শুয়ে থাকে উন্মুক্ত আকাশের নিচে। গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে তার চোখে জল আসে। কেউ তাকে দয়া করল না। স্ত্রী-পুত্রের কথা অনেকক্ষণ ভাবতে ভাবতে তার মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়। চোখে ঘোর আসে। সব কিছু অন্ধকার হয়ে যায়। আবার মনে হয়, তার শিয়রের কাছেই বসে আছে সুভদ্রা ও ধ্রুবকুমার, সে তাদের জীবন্ত স্পর্শ পাচ্ছে। তখন খুব চেষ্টা করেও কিছুতেই জেগে উঠতে পারে না সুরপতি। সে গভীর দুঃখে চেঁচিয়ে ওঠে, আমি কে? আমি কে? সুভদ্রা, বলল বলল, আমি কি সেই সুরপতি? তাহলে তোমরা লুকিয়ে আছ কেন?

সে এক অঞ্চলে বেশিদিন থাকতে পারে না। গ্রাম্য শিশুরা তাকে পাগল মনে করে বড় জ্বালাতন করে। তাকে কাঠি দিয়ে খোঁচায়, তাকে ঢিল মারে।

সুরপতি শিশুদের উদ্দেশে হাতজোড় করে বলে, বাবা সকল, আমাকে মেরো না, আমি বড় দুঃখী লোক।

শিশুরা সেই কথা শুনে খল খল করে হাসে। শিশুদের মতো নিষ্ঠুর আর কেউ নেই। তারা সুরপতির অনুনয়-বিনয়কে নতুন ধরনের পাগলামি মনে করে তাকে ভ্যাঙায়। সুরপতি যখন রাস্তা দিয়ে যায়, তখন একপাল শিশু তাকে ভেঙাতে ভেঙাতে পিছু পিছু যায়।

সুরপতি লোকের বাড়িতে গিয়ে কাজ চেয়েও দেখেছে। কেউ দেয় না। সকলেই তার চেহারা ও পোশাক দেখে ভয় পায়। কিন্তু নতুন পোশাক কেনার সামর্থ্য যে তার নেই, কেউ বোঝে না। সকলেই তার কথা শোনার আগেই তাকে দুর দুর করে তাড়িয়ে দেয়।

একটি গ্রামের দুষ্ট শিশুরা তাকে জ্বালাতন করতে করতে এক সময় তার পরিধানের কাপড়টা সম্পূর্ণই ছিঁড়ে দিল। তার কাপড় এমনিতেই ঝুলিঝুলি হয়ে গিয়েছিল, এখন আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না।

রাস্তার ওপর সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে সুরপতি হঠাৎ সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে গেল। বালকরা তার গায়ে ঢিল মারছে, কাঠির খোঁচা দিয়ে তার শরীর রক্তাক্ত করে দিচ্ছে, তবু তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে মনে মনে ভাবছে, দেখো সুরপতি, আজ তোমার কী অবস্থা! তুমি সপ্তগ্রামের সম্রান্ত বংশের আদরের দুলাল ছেলে। আজ তুমি ক্ষুধার্ত, উলঙ্গ, অপমানিত। এর চেয়ে চরম অবস্থা আর কী হতে পারে? এরপর কি আরও কিছু আছে? যদি থাকে তো শেষ দেখে নাও।

কাছাকাছি বাড়ি থেকে একটি লোক মোটা বাঁশ নিয়ে ছুটে এল। সুরপতির পিঠে সেই বাঁশের এক ঘা বসিয়ে দিলে লোকটি বলল, হতভাগা, আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে নচ্ছারপনা হচ্ছে? দূর হয়ে যা!

লোকে যেরকম ষাঁড় বা পথের কুকুরকে মেরে তাড়ায়, এর ভঙ্গি ঠিক সেই রকম। সুরপতির একবার মনে হল, লোকটির হাত থেকে বাঁশটা কেড়ে নিয়ে ওরই মাথায় এক ঘা মেরে দেয়। নিরপরাধকে শাস্তি দেবার ফল কী হয়, ও একটু টের পাক।

তারপর সুরপতি ভাবল, নিরপরাধরাই তো শাস্তি পায়। তার অর্থবল নেই, তার প্রতিপত্তিসম্পন্ন বান্ধব নেই। সে কারুব কাছে প্রমাণ করতে পারবে না যে সে নিরপরাধ। সবাই তাকে আবার শাস্তি দেবে। আবার সেই কারাগার।

সে লোকটির সামনে মাথা নিচু করে বলল, মারুন! আমাকে মেরে শেষ করে দিন।

আবার সে মাথা সরিয়ে নিল। না, এ-ভাবে মরা চলবে না। তাহলে সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারের সঙ্গে আর দেখা হবে না। ওদের সঙ্গে একবার শেষ দেখা করতেই হবে। যদি সুভদ্রা আজও বেঁচে থাকে, তাকে সুরপতি জানাবে যে, সেইচ্ছে করে ওদের পরিত্যাগ করে চলে যায়নি। বুধনাথের কাছে ধর্ষিতা হবার পর লজ্জায় ঘৃণায় সুভদ্রার বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সুরপতি তো লজ্জায় ঘৃণায় পত্নী পুত্রকে পরিত্যাগ করতে চায়নি।

সে বংশধারী লোকটিকে বলল, আমি চলে যাচ্ছি।

লোকটি তবু পিছন থেকে এক ঘা মারল সুরপতির পিঠে। কেটে গিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। মানুষ মানুষকে এমনিই মেরে আনন্দ পায়।

অন্য একটি বাড়ি থেকে আর একটি লোক বেরিয়ে এসে বলল, এখানে কী ব্যাপার হচ্ছে?

আগের লোকটি বলল, এই বেল্লিকটা আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কু-দৃষ্টি দিচ্ছিল। একে শায়েস্তা করা দরকার। আবার মুখের ওপর বলে কিনা মারুন!

দ্বিতীয় লোকটি বলল, মোটেই না, একে দেখে তো অসৎ লোক মনে হয় না। ইনি নিশ্চয়ই কোনও মুক্ত সাধুপুরুষ। আসুন সাধুবাবা, আমার বাড়িতে আসুন।

দ্বিতীয় লোকটি সুরপতিকে ডেকে নিয়ে গেল নিজের গৃহের দিকে। তারপর ফিস ফিস করে বলল, বাপু হে, তুমি তো সাধুপুরুষ নও, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা নেই, হাতে কমণ্ডলু নেই, দেখেই বুঝতে পারছি তুমি কোনও খুনি আসামি। তা হোক, তোমাকে আমি পরিধানের বস্ত্র দেব, পেট-চুক্তি আহার দেব, আরও দশটি সিক্কা টাকা দেব। তার বদলে তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। ওই যে লোকটি তোমার পিঠে বাঁশের ঘা মারল, ওর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিতে হবে। পারবে?

দুই পড়শিব বিবাদ, তার মধ্যে এক জন অপর জনের বিরুদ্ধে সুরপতিকে কাজে লাগাতে চায়। সুরপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এর নাম সংসারধর্ম। এর চেয়ে তার অরণ্যের জীবন অনেক ভাল ছিল।

সুরপতি লোকটির কথার কোনও উত্তর দিল না। শুধু একটু হেসে পিঠ ফেরাল।

সুরপতি সোজা হাঁটতে আরম্ভ করল। এক সময় সে এসে পৌঁছল গ্রামের শ্মশানে। এক শান্ত নদীর তীরে।

যাক, শ্মশানে কোনও ভয় নেই। শ্মশানে কেউ অত্যাচার করে না। এখানে সে উলঙ্গ থাকলেও কারুর সম্ভ্রম নষ্ট হবে না। শ্মশানের পাশেই তিন-চারটি প্রাচীন বটগাছ। কিছু পোড়া কাঠ, কয়েকটা ভাঙা হাড়ি পড়ে আছে, মানুষজন নেই।

সুরপতি একটা গাছতলায় উপুড় হয়ে শুয়ে অনকক্ষণ ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। লোকচক্ষুর আড়ালে এখানে তার কান্নায় কেউ ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে না।

কেঁদে কেঁদে বুক হালকা করে এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

তারপর অন্ধকার হল, প্রবল বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির মধ্যে একবার জেগে উঠেও সুরপতি স্থানত্যাগ করল না। গাছের তলার চেয়ে আর কোন ভাল জায়গা সে পাবে? ক্ষুধায়, ক্লান্তিতে তার উঠতেও ইচ্ছে করল না। আবার ঘুমোল।

তার পরিপূর্ণ ঘুম ভাঙল শেষরাত্রে। কয়েকটি নিশ্বাসের ফোঁস ফোঁস শব্দে। চোখ মেলে দেখল, তার কাছাকাছি শেয়াল ঘোরাফেরা করছে। এরা কি তাকে মৃত ভেবে খেতে এসেছিল? সুরপতি ধড়মড় করে উঠে বসল।

সে দেখল অদুরে সাদা পোশাক পরা আর একটি লোক চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তার পাশে চার পাঁচটা শেয়াল।

সুরপতি ভাবল, তার মতো এমন দুর্ভাগা আর কে আছে যে, এই শ্মশানে ঘুমোতে এসেছে?

সে দু'একটা পোড়া কাঠতুলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে শেয়ালগুলোকে তাড়াল। তারপর সেই লোকটির কাছে চলে এলে।

লোকটির পাশে নিঃশব্দে বসল সুরপতি। লোকটির অঙ্গে বেশ শৌখিন পরিচ্ছদ। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে প্রায় সুরপতির মতো। লোকটির মুখ অবশ্য দেখা যাচ্ছে না, লোকটি শুয়ে আছে মাটিতে মুখ গুঁজে।

লোকটি তত সুরপতির মতো উলঙ্গ আর নিঃস্ব নয়। তবু কী তার এমন দুঃখ যে, শ্মশানে এসে শুয়ে আছে।

সুরপতি ভাবতে লাগল, লোকটিকে জাগানো ঠিক হবে কি না। যদি লোকটি বিরক্ত হয়? কিন্তু যে-ভাবে শেয়ালের দল ঘোরাফেরা করছে, তাতে এখানে এ-ভাবে শুয়ে থাকাও বিপজ্জনক। সে মৃদুস্বরে ডাক, ভদ্র, উঠুন।

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

সে আবার ডাকল, ভদ্র, উঠুন! এ-ভাবে শুয়ে থাকবেন না!

এবারেও সাড়া না পেয়ে সুরপতি লোকটির অঙ্গ স্পর্শ করল। সঙ্গে সঙ্গে সে চমকে উঠল। স্পর্শমাত্রই বোঝা গেছে যে, লোকটি মৃত। নিশ্চয়ই লোকটিকে দাহ করতে আনা হয়েছিল, বৃষ্টি বাদলার মধ্যে শ্মশানবন্ধুরা ওকে এই অবস্থায় ফেলে পালিয়েছে।

সুরপতি মৃতদেহটি উলটে দিয়ে আবার বিস্ময়ের শব্দ করে উঠল। মৃতের বুকে একটি আমূল ছুরি বেঁধা। এবং মৃত লোকটিকে দেখতেও যেন ঠিক সুরপতির মতো। যেন সুরপতিই এখানে ছুরিবিদ্ধ অবস্থায় নিহত হয়ে পড়ে আছে। সুরপতির এখনকার চেহারা নয়, সপ্তগ্রামে ধনীর দুলাল হিসেবে তার এই রকমই রূপ ছিল। তাহলে এই কি বংশীলাল? এই তার জীবনের কুগ্রহ? বংশীলালের শেষ পর্যন্ত এই নিয়তি হল? কিন্তু আর একটু খুঁটিয়ে দেখার পর সুরপতি বুঝতে পারল, লোকটির সঙ্গে তার চেহারার বেশ কিছু অমিলও আছে। এর নাক একটু বেশি তীক্ষ্ণ, মাথায় চুল সামান্য কুঞ্চিত। বোধহয় এ বংশীলাল নয়, অন্য কেউ।

মৃতদেহটির পাশে একটি মাটির মালসায় কিছু চাল আর ফুল বেলপাতা। ক্ষুধার জ্বালায় সে সেই কাঁচা চালই চিবিয়ে চিবিয়ে খেল খানিকটা। আর খানিকটা চাল সেই মৃত লোকটির মুখেও গুঁজে দিল, যাতে কোনও অবিচার না হয়।

মৃত লোকটির দিকে তাকিয়ে সুরপতির মাথায় একটা পরিকল্পনা এল। এবার তার জীবন পালটাতে হবে। আর দেরি করা চলে না। সে প্রথমে নদীতে নেমে খুব ভাল করে স্নান সেরে নিল। বালি মাটি দিয়ে সারা শরীর মেজে পরিষ্কার করল। তারপর উঠে এসে মৃত লোকটির সমস্ত পোশাক খুলে সে নিজে পরে নিল। লোকটি প্রায় তারই বয়সী হবে। লোকটির দুই হাতে দুটি সোনার আংটি ছিল। সে-দুটিও খুলে নিতে সে দ্বিধা করল না। একটি আংটি লাল পাথরের, অন্যটি সবুজ। চুনি আর পান্না।

মৃত্যের কাছ থেকে এই উপকার পাওয়ার বিনিময়ে সে সেই মৃতদেহটি শিয়ালের খাদ্য হতে দিল না। কী ভেবে সে শেষ মুহূর্তে মৃতের বক্ষে বেঁধানো ছুরিটাও খুলে নিয়ে লুকিয়ে রাখল নিজের পোশাকের মধ্যে। দেহটি কোলে করে এনে সে নদীতে ভাসিয়ে দিল। তারপর সে পা চালাল জোরে জোরে।

রাত্রি শেষ হবার আগেই তাকে এ গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। এবার আর কোথাও নয়। দারুকেশর।

মৃতের পোশাক পরে প্রায় নতুন মানুষ হয়ে সুরপতি শ্মশান ছেড়ে এসে উপস্থিত হল জনপদে। তার প্রথম কাজই হল কিছু অর্থ সংগ্রহ করা। দু'টি আংটির মধ্যে একটি বিক্রয় করলেই কিছু অর্থ পাওয়া যাবে। অপরের দ্রব্য বিক্রয় করার ব্যাপারে সুরপতির বিবেকে একটু খোঁচা লাগতে লাগল। সুরপতি এর আগে কোনও দিন পরের দ্রব্য ভোগ করেনি। কিন্তু সে এই বলে তার মনকে বোঝালো যে, মৃতের সম্পত্তি কারুর নয়। মতদেহটি সবসমেত নদীতে ভাসিয়ে দিলে এই আংটি দু'টি নদীগর্ভে লীন হয়ে যেত। তার বদলে কোনও মানুষের ভোগে লাগা অন্যায় নয়।

কিছু মানুষজনের কাছে খোঁজখবর নিয়ে সুবপতি জানল যে, দারুকেশর সেখান থেকে বহুদূর। অন্তত সাত দিনের পথ। এই সাত দিনের একটা রাহাখরচ আছে। দারুকেশরের সেই সরাইখানায় সুভদ্রা এবং ধ্রুবকুমার এখনও আছে কিনা তার ঠিক নেই, তবু সেখান

থেকেই অনুসন্ধান শুরু করতে হবে। নিঃস্ব অবস্থায় সুরপতি অনুসন্ধান চালাবেই-বা কী করে?

গঞ্জের হাটে এক মণিকারের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল সুরপতি। দু'টি আংটিই এক সঙ্গে বিক্রয় করা উচিত নয়, একটা থাক ভবিষ্যতের জন্য। একটা থাক আঙুলে, একটা যাক মণিকারের কাছে।

এবারেও একটা সমস্যা দেখা দিল। কোনটা বিক্রয় করবে, লাল না সবুজটা? চুনি না পান্না? দুটি আংটিই সমান সুন্দর, ওজনও দু'টিরই সমান। সুরপতি কিছুতেই মনস্থির করতে পারে না, একবার বাঁ হাত একবার ডান হাতের দিকে তাকায়। লাল না সবুজ? চুনি না পান্না?

শেষ পর্যন্ত সুরপতি পান্না-বানো আংটিটিই নিজের কাছে রাখবে ঠিক করল। সবুজ পাথরটি যেন সাপের চোখের মতন দৃষ্টি আকৃষ্ট করে রাখল। সুরপতি লাল পাথর-বসানো আংটিটি নিয়ে মণিকারের দোকানে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে নিয়তি তার সঙ্গে আর একটা নিষ্ঠুর খেলা খেলল।

পৃথিবীর সব দেশের মণিকাররাই অতিশয় ধূর্ত হয়। এই মণিকারটিও সুরপতির কথাবার্তা শুনেই বিদেশি বলে বুঝে নিয়েছিল, তাই সেই মূল্যবান আংটিটি নিয়ে বহু দরাদরি করে শেষ পর্যন্ত পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রার বেশি দিতে কিছুতেই সম্মত হল না। সুরপতি সেই পাঁচ স্বর্ণমুদ্রা নিয়েই বেরিয়ে এল।

প্রথমেই তার প্রয়োজন জঠরাগ্নি নিবারণের। সেখানে গঞ্জের ব্যাপারিদের জন্য কয়েকটি ছোট ছোট পান্থশালা আছে, সেগুলি থেকে ভাত রান্নার গন্ধ ভেসে আসছে। একটি পান্থশালায় ঢুকেসুরপতি প্রায় তিন জন মানুষের খাদ্য এক সঙ্গে খেয়ে ফেলল। বহু দিন পর, সেই সপ্তগ্রাম ছেড়ে আসার পর এই প্রথম সে সুস্থির ভাবে বসে ইচ্ছানুরূপ আহার্য ভোগ করতে পারছে।

একটি স্বর্ণমুদ্রা ভাঙিয়ে সে দাম চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তারপর যাত্রা শুরু করল দারুকেশ্বরের পথে। বেশি দূর যেতে পারল না অবশ্য, এক প্রহর বাদেই সে একটি গাছতলায় বসে বমি করল। এত দিন বাদে এত প্রভূত পরিমাণে আমিষ-সহ খাদ্য তার সহ্য হবে কেন? অবশ্য বমির ফলে তার শরীর অনেকটা হালকা হয়ে গেল, সে তেমন অসুস্থ বোধ করল না। তবু তক্ষুনি পথচলার বদলে সে ঘুমিয়ে রইল সেখানে।

ঘুম ভাঙার পর সে দেখল তার শিয়রের কাছে এক ব্যক্তি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুরপতি দ্রুত উঠে পড়ল। তার মনে হল, লোকটি নিশ্চয়ই কোনও তস্কর বা দস্যু। সুরপতির কাছে স্বর্ণমুদ্রা আছে, একটি মূল্যবান আংটি আছে, দস্যু তস্কররা তো আকৃষ্ট হবেই। অবশ্য এক-আধ জন দস্যু তার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। সুরপতি এখন আত্মরক্ষায় সক্ষম।

সুরপতি প্রশ্ন করল, আপনি কে?

লোকটি বলল, আমি একজন পথিক। আপনার নিদ্রা-ভাঙার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

সুরপতি বলল, আপনার সঙ্গে আমার পুর্বপরিচয় আছে, এমন তো স্মরণ হয় না। আমার সঙ্গে আপনার কী প্রয়োজন?

লোকটি বলল, আমার মনে হল, আপনিও এক জন পথিক। আমার ইচ্ছা, আপনার সঙ্গে এক সঙ্গে পথ চলি। অপরাহ্ন হয়ে আসছে, পথে অনেক বিপদের আশঙ্কা আছে, তাই উভয়ের এক সঙ্গে যাওয়াই ভাল।

সুরপতিতীক্ষস্বরে প্রশ্নকরল, আপনি কীভাবে ঘুমন্ত অবস্থাতেও আমাকে দেখে অনুমান করলেন যে, আমি এক জন পথিক?

লোকটি এবার হেসে উত্তর দিল, পথিক ছাড়া অন্য কেউ কি পথের ধরে বৃক্ষতলায় ঘুমোয়? বিরক্ত হবেন না, আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমি একজন বণিক, আমার সঙ্গে বেশকিছু অর্থ আছে, তাই আপনার সহায়তা চাই।

সুরপতির সন্দেহ আরও দৃঢ় হল। তস্কর বা প্রতারাই এরকম দুর্বল সেজে আসে। অন্য কেউ স্বেচ্ছায় নিজের কাছে অর্থ থাকার কথা প্রকাশ করে না।

সুরপতি জিজ্ঞেস করল, মহাশয় কোন পথে যেতে ইচ্ছে করেন? লোকটি দারুকেশ্বরের দিকের পথই দেখাল।

সুরপতি বলল, আমি একজন ভবঘুরে, কোন পথে যাব তা এখনও স্থির করতে পারিনি, আপাতত আরও কিছুক্ষণ এই বৃক্ষতলে বায়ু সেবন করতে চাই। আপনি অন্য সঙ্গীর খোঁজ করুন।

লোকটি খুবই দুঃখের ভঙ্গি করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিনা বাক্যব্যয়ে চলে গেল। সুরপতি আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সেখানে। তারপর যাত্রা শুরু করল।

অপরাহ্ন গাঢ় হয়ে এসেছে, দীর্ঘ ছায়া নেমে আসছে ধীরে ধীরে। ধূ-ধূ করা প্রান্তরের মধ্যে পথ। সাবধানতার জন্য সুরপতি রাত্রে পদযাত্রা করতে চায় না। রাত্রে কোনও সরাইখানায় বিশ্রাম নেবে। দুতিন ক্রোশের মধ্যেই আর একটি নগর আছে। সন্ধ্যার আগেই সেখানে পৌঁছতে হবে। আকাশের অবস্থা ভাল নয়, রাশি রাশি কালো মেঘ উড়ে আসছে কোথা থেকে।

কিছু দূরেই দেখা গেল একটা বৃক্ষের আড়ালে সেই লোকটি দাঁড়িয়ে আছে। পাশে এক জন সঙ্গী। স্থানটিতে ছায়া ছায়া অন্ধকার। সুরপতি বুঝে নিল যে, লোক দু'টির মতলব ভাল নয়। কিন্তু ভয়ের চিহ্ন দেখালে আরও বেশি বিপদ। তাই সে লোক দু'টিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেই এগিয়ে গেল।

পিছন থেকে সেই লোকটি জিজ্ঞেস করল, ভবঘুরে মহাশয়, শেষ পর্যন্ত এই পথেই যাওয়া ঠিক করলেন নাকি?

সুরপতি বলল, হ্যাঁ।

দাঁড়ান, আমরাও সঙ্গে যাব।

আমার আগ্রহ নেই।

সুরপতি ঠিক সময়েই পিছনে ঘুরে তাকিয়েছিল, তখন এক জন তাকে মারবার জন্য একটি লাঠি তুলেছে। লাঠির আঘাত তার মাথায় না লেগে লাগল ঘাড়ে। সুরপতি ব্যাঘ্রের মতো লোক দুটির ওপর লাফিয়ে পড়ল।

কারাগারে নিয়মিত কঠোর পরিশ্রম করার ফলে তার শরীর এখন লোহার মতো শক্ত। সুরপতি অতি অল্প সময়েই সেই দস্যু দুটিকে জব্দ করে ফেলল, সে ছুরিকাঘাতে তাদের শেষ করে দিতে পারত, কিন্তু তার বদলে মুষ্টির আঘাতেই ওদের অজ্ঞান করে ফেলল। তারপর ওদেরই বস্ত্র নিয়ে ওদেরই হাত-পা শক্ত করে বেঁধে ফেলে রাখল সেখানে।

এই ক্ষুদ্র ঘটনায় সুরপতির মনের জোর বেড়ে গেল অনেক। দু'জন দস্যুকে সে এত সহজে ভূপাতিত করেছে যে, এরপর একটি বড় দল আক্রমণ করলেও সে তেমন ভয় পায় না।

লোক দুটি মুক্তির জন্য কাকুতি মিনতি করছে। কিন্তু সুরপতি আর ভ্রুক্ষেপ করল না। লোক দুটিকে সারা রাত এখানে পড়ে থাকতে হবে, সকালবেলা কেউ না-কেউ নিশ্চয়ই ওদের মুক্তি দেবে। এইটুকু শাস্তি ওদের প্রাপ্য। ওরা যদি লাঠির ঘা সুরপতির মাথায় ঠিক মতো কষাতে পারত, তাহলে সুরপতির মৃতদেহ পড়ে থাকত এখানে। অবশ্য রাত্রের মধ্যে হিংস্র পশু আক্রমণ করতেও পারে ওই দুজনকে। কিন্তু যারা নিজেরাই হিংস্র, তাদের এই রকম নিয়তির ওপর নির্ভর করাই উচিত। আজ থেকে ক'বছর আগেও সুরপতি দু'জন

মানুষকে এ-রকম অবস্থায় ফেলে রেখে যেতে পারত না, কিন্তু এখন সে অনেক বদলে গেছে।

বনের মধ্য দিয়ে সুরপতি সতর্ক হয়ে হাঁটতে লাগল। সায়াহ্ন ঘনিয়ে এসেছে। রাত্রিকালে সুরপতি বিশ্রাম নিতে চায়, তাকে বহু দূর যেতে হবে। বেশি ব্যস্ততা দেখাবার কোনও প্রয়োজন নেই, এতগুলি বছর পার হয়ে গেছে যখন, তখন আর দু'চার দিন কাটলেই-বা কী এমন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে। সব চেয়ে বড় কথা, তাকে বেঁচে থাকতে হবে এখন।

ভালয় ভালয় সে বনপথটা পার হয়ে এল। এবার পথের ধারে দু'একটি গৃহ দেখা যাচ্ছে। তাহলে অদূরেই কোনও জনপদ থাকার কথা। সুরপতির জঠরে কোনও খাদ্য নেই, সব বমির সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। শরীর দুর্বল লাগছে। এ-বেলা অল্প কিছু আহার করে কোনও সরাইখানায় বিশ্রাম নেবে।

কিন্তু এই সময় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির সঙ্গী হয়ে এল ঝড়। বাতাস ও জল তোলপাড় করে দিল সমস্ত প্রকৃতিকে। এত বৃষ্টি ও ঝড়ের মধ্যে গুলে গেছে অন্ধকার। সামনের পথ আর কিছুই দেখা যায় না। তবুসুরপতি ছুটল, তাকে যে-কোনও উপায়ে একটা সরাইখানায় পৌঁছতেই হবে।

কিন্তু বেশি দূর অগ্রসর হওয়া গেল না। এত ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ছুটে যাওয়া প্রায় উন্মাদের প্রয়াস। বেশ কয়েক বার হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল সুরপতি। বাধ্য হয়ে সুরপতিকে এক বৃক্ষতলে দাঁড়াতে হল। কিন্তু সেখানেও আশ্রয় নেই, অবিশ্রান্ত জল ঝরছে। এবং একটু পরেই প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। বিদ্যুতের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল সুরপতির, বাজের শব্দে কানে তালা লাগল এবং তার চেয়েও বড় একটা বিপদের চিন্তা ধাক্কা মারল তার বুকে। এ-রকম দুর্যোগের মধ্যে কোনও বড় বৃক্ষের নিচে দাঁড়ানো মোটেই নিরাপদ নয়। বড় বড় বৃক্ষগুলিই বজ্রপাতকে আকর্ষণ করে। বাজে পোড়া বৃক্ষ সুরপতি অনেক দেখেছে।

পর পর আরও দু'বার বজ্রপাত হল। খুব কাছেই। তাকে এ স্থান ছেড়ে যেতেই হবে। সামনের দিকে তাকিয়ে বিদ্যুতের চকিত আলোকে সুরপতি দেখল খানিকটা দূরে একটি

দ্বি-তল গৃহ। সাদা রঙের। কাছাকাছি আর কোনও গৃহ নেই, মাঠের মধ্যে অন্ধকারে ওই একটি গৃহ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে যেন।

আর কোনও কিছু চিন্তা না করে সুরপতি দৌড়ে গেল সে-দিকে। তার মনে হল, এখন যেন তার মাথায় একটি বাজ পড়বে। কোনও ক্রমে সে সেই গৃহের ফটকের কাছে পৌঁছল। সৌভাগ্য ক্রমে ফটকটি ভোলাই ছিল। দ্বিধা না করে সে ভেতরে ঢুকে গিছে দাঁড়াল অলিন্দের নিচে। এখন সে নিরাপদ।

সুরপতির সর্বাঙ্গ ভেজা, মাথা থেকে জল গড়াচ্ছে। এই অবস্থায় তাকে কতক্ষণ থাকতে হবে কে জানে। ঝড়বৃষ্টি থামবার কোনও লক্ষণ নেই। এই গৃহটি কার? এখানে কি আশ্রয় পাওয়া যাবে? কোনও মানুষজনের সাড়াশব্দ নেই। সুরপতি দ্বারে আঘাত করতেও সাহস পেল না। এই ক'বছরে তার এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, সে কোনও মানুষকেই আর বিশ্বাস করে না। মানুষ দেখলেই তার ভয় হয়। সে একলা পথিক, এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে একটি গৃহের অলিন্দে এসে আশ্রয় নিয়েছে, এ-জন্যও যদি কেউ তাকে অন্য রকম সন্দেহ করে?

একটু পরেই ভিতরের দ্বার খুলে গেল। প্রদীপশিখা করতলে ঢেকে এক জন স্ত্রীলোক এসে দাঁড়াল সেই দ্বারে। স্ত্রীলোকটি মধ্যবয়সিনী, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, কিন্তু চোখে সুর্মা টানা, ওষ্ঠে তাম্বুলরাগ।

স্ত্রী লোকটি সুরপতির দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি ভিতরে আসুন।

সুরপতি কয়েক পলক তাকিয়ে দেখল রমণীর দিকে। তারপর বিনীতি ভাবে বলল, প্রবল বৃষ্টির জন্য আমি এখানে আশ্রয় নিয়েছি। বৃষ্টি ফুরালেই চলে যাব।

রমণী আবার বলল, আপনি ভেতরে আসুন

সুরপতি বলল, তার প্রয়োজন নেই। আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে, আমি এখানেই বেশ আছি।

রমণী বলল, আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ সব ভেজা, আমাদের মালিকানি আপনাকে ভেতরে আসতে বললেন।

সুরপতি সেই রমণীর সঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করল। ভেতরে একটি লম্বা চত্বর। দু'দিকে সারি সারি ঘর। একটি ঘরের দ্বার খুলে রমণীটি সুরপতিকে বলল, এই গোসলখানার মধ্যে পানি আছে, আপনি হাত-পা ধুয়ে নিন। শুষ্ক বস্ত্রও আছে, সেসব পরে নেবেন, লজ্জা করবেন না।

সুরপতি ভেতরে ঢুকে দেখল, গোসলখানার মধ্যে বড় বড় দুটি রুপোর বাতিদানে মোম জ্বলছে। মাটির বড় বড় জালা ভর্তি জল। একটি তাকে রয়েছে কয়েকটি আতর ও কেশ তৈলের শিশি। এক পাশে একটি দড়িতে ঝোলানোকয়েক প্রস্ত পুরুষের পোশাক। পোশাকগুলি বেশ মূল্যবান ও নতুন।

সুরপতি বিমূঢ় হয়ে গেল। এ কোথায় এল সে? এরা তাকে এত খাতির করছে কেন? আবার কি সে কোনও বিপদের মধ্যে পা দিতে যাচ্ছে? তার তো কোনও দোষ নেই। কিন্তু শুধুকি দোষী ব্যক্তিরই বিপদ আসে?

একটুক্ষণ সাত-পাঁচ ভাববার পর সুরপতির বস্ত্র বদলে নিল। নতুন বস্ত্র তার অঙ্গে মানিয়ে গেল বেশ। এখন সে যেন একটি নতুন মানুষ।

দরজা খুলে বাইরে আসতেই দেখল, সেই রমণীটি অপেক্ষা করছে। সে বলল, আসুন।

এবার তারা প্রবেশ করল আর একটি কক্ষে। কক্ষটি দারুণ ভাবে সাজানো। মেঝেতে লাল রঙের গালিচা পাতা, একটু উঁচু পালঙ্কের ওপর সাদা দুগ্ধফেননিভ শয্যা পাতা। পালঙ্কের শিয়রের কাছে একটি কাশ্মীরি কাজ করা কাঠের পাত্রে কিছু ফলমূল রাখা।

রমণীটি বলল, আপনি এখানে বিশ্রাম করুন। সুরপতি জিজ্ঞেস করল, আপনি কে? আমাকে কেন এত যত্ন করছেন?

রমণী বলল, আমি কেউ নই, আমি এ বাড়ির এক জন বাঁদি। আপনি অতিথি আমাদের।

সুরপতি বলল, আমি এক জন সামান্য লোক। ভবঘুরে পথিক। আমি আপনাদের এত যত্নের যোগ্য নই।

রমণী বলল, আপনি অতিথি সেই তো যথেষ্ট।

রমণীটি সুরপতিকে একা রেখে চলে গেল। সুরপতি অভিভূতের মতো বসে রইল। এ-সব কি স্বপ্ন? যে-বাড়ির বাদিরই এত সাজসজ্জা, সে-বাড়ির মালিকানি যেন কত না ধনী। বাড়িতে কোনও পুরুষমানুষ নেই? আর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছেনা।

একটু পরেই সেই রমণীটি আবার এল, হাতে একটা রুপোর বড় রেকাব, তাতে কিছু কাবাব, রুটি, একটি বাটিতে মিষ্টান্ন, আর একটি পাত্র ভরা সুরা।

রমণী বলল, আপনি নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত। সামান্য কিছু খাদ্য এনেছি খেয়ে নিন। তারপর আমাদের মালিকানি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।

সুরপতি বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞেস করল, আপনাদের মালিকানি কে?

রমণী বলল, বেগম রশিদা খান। আপনি তার নাম শোনেননি? সুরপতি বলল, আমি পরদেশি মানুষ। এখানকার কিছুই জানি না।

বেগম রশিদা খান এ রাজ্যের সব চেয়ে বড় তয়ফাওয়ালি। রাজা বাদশারা তার দয়া পেয়ে ধন্য হয়ে যান।

তিনি যে আমার মতো সামান্য এক জন মানুষকে এত দয়া করছেন, সেজন্য আমি কৃতার্থ হয়ে গেছি। বেগমকে আমার একশো কুর্নিশ জানাবেন।

বেগমের মন ভাল নেই। উনি সাধারণত থাকেন আজিমগঞ্জে। এটা ওঁর মন খারাপের বাড়ি। মন খারাপ হলে নগরের ভিড় ওঁর ভাল লাগে না, এখানে চলে আসেন।

বেগমের মন খারাপ কেন?

বেগমের পেয়ারের মানুষ ইউনুস খাঁ ওঁকে ছেড়ে চলে গেছেন। আজ দশ দিন, তার আর দেখা নেই।

ইউনুস খাঁর সঙ্গে বেগমের শাদি হয়েছিল?

তয়ফাওয়ালির কখনও শাদি করতে নেই। ইউনুস খাঁ ছিলেন বেগমের দিল-পসন্দ পেয়ারের লোক। তিনি বিবাহিত। কিন্তু প্রত্যেক দিন মাঝ রাতে বেগমের সঙ্গে এসে দেখা করতেন। হঠাৎ তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। নিজের বাড়িতেও যাননি। আপনি খেয়ে নিন। একটু পরে মালিকানি এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

রমণীটি চলে গেল। সুরপতির মনে হল, এইসবটাই যেন রূপকথা। এ কোথায় সে এসে পড়ল? এত সুখ তার সইবে তো? এমন মনোরম আশ্রয়টা যখন পাওয়া গেছে, তখন রাত্তিরটা এখানেই কাটানো যাক। কিন্তু কাল ভোরেই সে চলে যাবে। বেশি লোভ করতে নেই।

সত্যিই তার খিদে পেয়েছিল খুব, সে দ্বিধা না করে সব খাবারটুকু শেষ করল। সুরার পাত্র স্পর্শ করল না। তাদের পরিবারের কেউ কোনও দিন সুরা পান করেনি।

আহার শেষ করে সে ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে বিছানায় একটু গড়াতে যেতে আবার দারুণ চমকে উঠল। বাইরে হঠাৎ একটা বাঘ ডেকে উঠল। খুব কাছ থেকে, যেন এ গৃহের প্রাঙ্গণেই। সর্বনাশ, গৃহের মধ্যে বাঘ ঢুকে এসেছে নাকি?

আত্মরক্ষার জন্য সুরপতির প্রথমেই মনে হল তার কক্ষের দ্বার বন্ধ করে দেওয়া দরকার। কিন্তু সে-পর্যন্ত যেতে পারল না, তার আগেই দ্বার ঠেলে ঢুকে এল একটা পূর্ণবয়স্ক বাঘের মুখ, তীব্র জ্বলন্ত দুই চোখে তাকাল সুরপতির দিকে।

সুরপতি ভাবল, এই তার শেষ। এবার বাঘের মুখেই তাকে প্রাণ দিতে হবে। তার কাছে একটা ছুরিকা আছে, কিন্তু সামান্য ছুরিকা নিয়ে কে কবে বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে পেরেছে! সে আস্তে আস্তে দেয়ালের দিকে পিছিয়ে যেতে লাগল। বস্ত্রের অভ্যন্তর থেকে সে ছুরিকাটা বার করে একহাতে মুঠো করে ধরেছে।

বাঘটা ঘরের মধ্যে ঢুকে স্থির হয়ে দাঁড়াল। তক্ষুনি সুরপতির ওপর লাফিয়ে পড়ার কোনও উদ্যোগ করল না। তখন সুরপতি লক্ষ্য করল, বাঘটির গলায় একটি সোনার শৃঙ্খল বাঁধা।

সেই শৃঙ্খলের এক প্রান্ত ধরে ঘরে ঢুকল আর একটি রমণী। কালো মখমলের কাঁচুলি ও ঘাঘরা পরা। মুখের ওপর একটা সূক্ষ্ম বস্ত্রের ওড়না চাপা দেওয়া। তবু তাতেও তার মুখ স্পষ্ট দেখা যায়। রমণী অসাধারণ রূপসী।

ভীত, কম্পিত শরীরে সুরপতি তাকে অভিবাদন জানাল।

বীণার ঝঙ্কারেরমতোকণ্ঠে রমণী বলল, আপনি বসুন। শের আলিকে দেখে আপনি ভয় পাবেন না। নিরীহ লোককে একখনও আক্রমণ করে না। পরদেশি আপনার নাম কী?

সুরপতি নিজের নাম জানাল।

রমণী বলল, আমার নাম রশিদা খানম, আমারবাদির কাছে বোধহয় শুনেছেন আগেই। এই দারুণ দুর্যোগের মধ্যে আপনি আমারঅলিন্দে আশ্রয় নিয়েছিলেন, আমি গবাক্ষ থেকে দেখেছিলাম। আপনার নিবাস কোথায়? কোথায় যাচ্ছিলেন?

সুরপতি আত্মপরিচয় গোপন করে বলল, আমি পথিক, পথই আমার ঘর। আমি দেশে দেশে ভ্রমণ করি নিজের খেয়ালে।

রশিদা খানম্ একটা কেদারায় বসল। বাঘটি দাঁড়িয়ে রইল দরজার কাছে। রশিদা খানম্ বলল, আমি সাত দিন কারুর সঙ্গে কথা বলিনি, আমার মন ভাল নেই। আজ আমার বড় বেশি কষ্ট হচ্ছে, আমার অন্যমনস্ক হওয়া দরকার। আপনি বহু দেশ ঘুরেছেন। অনেক কাহিনি কিস্যা জানেন, আমাকে তার দু-একটি শোনান। আসুন, এক পাত্র সুরা পান করতে করতে আপনার কিস্যা শুনি।

রশিদা খান দু'টি পাত্রে সুরা ঢেলে একটি সুরপতির দিকে এগিয়ে দিতেই সে হাত জোড় করে বলল, মাপ করুন বেগম, আমি সুরা পান করি না, আমার অভ্যাস নেই।

রশিদা খানম্ একটু কৌতূহলী হয়ে বলল, আপনি সুরা পান করেন না? হিন্দুর তো সুরাপানে নিষেধ নেই! আপনি ব্রাহ্মণ?

সুরপতি বলল, না। আমি বৈশ্য এবং বৈষ্ণব। রশিদা খানম্ বলল, ও তাই। বৈষ্ণব বৈষ্ণবদের কারণবারি পান করাও গুনাহ।

তারপর রশিদা খানম্ অধরোষ্ঠ ফাঁক করে মুক্তাপংক্তির মতো দাঁতে ঝর্ণার মতো হাসি ঝরিয়ে জিজ্ঞেস করল, কিন্তু আপনি যে যবনের বাড়িতে আহার করলেন, তাতে আপনার জাত যাবেনা?

সুরপতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ক্ষুধার্তের আবার জাত কী? আপনি যে আমাকে আশ্রয় এবং আহার্য দিয়েছেন, এজন্য আমি কৃতার্থ।

রশিদা খানম্ বলল, হিন্দুদের অনেক ব্যাপার আমি জানি। আমার যে মনের মানুষ, সে-ও আগে হিন্দু ছিল। ধর্মান্তরিত হবার আগে তার নাম ছিল কৃষণ। আমি এখনও তাকে কৃষণ বলে ডাকি। আমি যে গান গাই, তাতে কৃষণজি আর রাধার অনেক কথা থাকে। হায়, আমার সেই কৃষণ আমাকে ছেড়ে কোথায় যে গেল।

সুরপতি মাথা নিচু করে স্তব্ধ হয়ে রইল। এই রমণীর দিকে সে ভালভাবে তাকাতেই পারল না। অসম্ভবতীব্র এর রূপ। তার স্ত্রী সুভদ্রাও অসামান্য রূপসী, কিন্তু সুভদ্রার রূপে আছে স্নিগ্ধ আলো। আর এই তয়ফাওয়ালির রূপ যেন দীপ্ত বহ্নি।

রশিদা খানম্ জিজ্ঞেস করল, আপনি যে পথ ধরে এলেন, সে পথে ইউনুস খাঁ বলে কোনও ব্যক্তির সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছে?

সুরপতি সংক্ষেপে বলল, না।

রশিদা খান সুরার পাত্রে চুমুক দিয়ে বলল, সে যেখানেই থাক সে ঠিক ফিরে আসবে। আপনি একটা কিস্যা বলুন।

মুখে মুখে গল্প বলার অভ্যেস নেই সুরপতির। সে বাকপটু নয়। তবু রশিদা খানমের বার বার অনুরোধে সে নিজের জীবনের কাহিনিই খানিকটা অন্য রূপ দিয়ে সবিস্তারে বলল। দুটি লোক ছিল ঠিক একই রকমের চেহারার। এক জনের নাম রঘুপতি, আর এক জনের নাম বংশীলাল। তারপর বংশীলালের বদলে ভুল করে রাজসেনারা রঘুপতিকে ধরে...।

সুরপতি গল্প শেষ করার পর রশিদা খানম ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করল, তারপর? তারপর? রঘুপতির সঙ্গে বংশীলালের দেখা হয়নি?

সুরপতি বলল, জেল থেকে পালিয়ে এসেছে রঘুপতি, সেইসময় তার সঙ্গে আমার একসরাইখানায় দেখা হয়। তার মুখেই আমি তার এই বিড়ম্বিত জীবনের কাহিনি শুনেছি। রঘুপতি এর পর যাবে তার স্ত্রী-পুত্রকে খুঁজতে। শেষ কী হবে, আমি জানি না।

রশিদা খানমের চোখে অশ্রু এসে গেল। সে বলল, আহা, মানুষটা বড় দুঃখী। পরদেশি, আমার মন খারাপ, এর ওপর আপনি আমাকে আবার একটা দুঃখের গল্প শোনালেন কেন? আপনি কোনও মজাদার কিস্যা জানেন না?

সুরপতি বলল, আমি আর তো কিছু জানি না।

রশিদা খানম্ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি ক্লান্ত, আপনি এখন বিশ্রাম করুন। কাল আবার কথা হবে। চল শের আলি।

সুরপতি বলল, আমি কাল প্রভাতেই এখান থেকে চলে যেতে চাই।

বিচিত্র হাস্য করে রশিদা খানম্ বলল, কেন, এখানে আপনার কোনও কষ্ট হচ্ছে?

সুরপতি বলল, না না, কষ্ট কী! এত খাতির-যত্ন আমি জীবনে পাইনি। কিন্তু কত দিন আর এই অকারণ আতিথ্য নেব আপনার কাছে?

রশিদা খানম বলল, আপনি পথিক, আপনার তো কোনও নির্দিষ্ট জায়গায়, নির্দিষ্ট সময় পৌঁছনোর কথা নেই। সুতরাং ব্যস্ততা কীসের? মানুষ শুধু মৃত্যুর কাছেই পৌঁছয়।

কী বললেন?

সব মানুষ শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কাছে পৌঁছয়। আর তো কোথাও তার পৌঁছবার কথা থাকেনা।

রশিদা খানম্ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সুরপতি অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, ওর এই শেষ কথাটার মানে কী? হঠাৎ মৃত্যুর কথা কেন? একটা পূর্ণবয়স্ক বাঘকে শেকল বেঁধে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাখে। এ নারী অতি সাংঘাতিক। অথচ কত নরম, কত সুন্দর, নিষ্পাপ মুখ। এমন নারীর সন্দর্শনও ভাগ্যের কথা। মূর্খ ইউনুস একে ছেড়ে চলে গেছে কেন?

একটু পরে সুরপতি শুনল, বাড়ির ভেতর থেকে গান ভেসে আসছে। তয়ফাওয়ালি রশিদা খানম্ একা একা গলা সাধছে। ঠিক মনে হয়, কোনও বিরহী রাতপাখির ব্যাকুল চিৎকার।

সেই গান শুনতে শুনতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল সুরপতি। ঘুমের মধ্যে মানুষের স্মৃতিতে বহু রকমের খেলা চলে।

আবার খানিক পরে সুরপতির ঘুম ভাঙল। সে টের পেল তার মাথায় একটা কোমল হাতের স্পর্শ। সে অন্ধকারের মধ্যে হাত বাড়িয়ে ধরল সেই হাত। সত্যি কারও বাস্তব হাত।

সুরপতি জিজ্ঞেস করল, কে সুভদ্রা?

স্পষ্ট উত্তর শুনল, হ্যাঁ।

সুরপতি আবার জিজ্ঞেস করল, তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

উত্তর এল, আমি তো এখানেই।

সুরপতি বলল, না, তুমি এখানে ছিলে না, তুমি হারিয়ে গিয়েছিলে। সুভদ্রা আমার মাথায় দারুণ যন্ত্রণা, আমি চোখ মেলতে পারছি না, তুমি আমাকে ফেলে চলে গিয়েছিলে কেন?

উত্তর এল, আপনার মাথায় এখনও যন্ত্রণা আছে?

সুরপতি বলল, হ্যাঁ, দারুণ যন্ত্রণা, তুমি জানো না, ওরা আমাকে কী সাংঘাতিক ভাবে মেরেছে।

তুমি আর একটু ঘুমোও, সব ঠিক হয়ে যাবে। সুরপতি এখন ঘুমোবে কী, সুভদ্রাকে সে খুঁজে পেয়েছে, এই কি তার ঘুমোবার সময়?

সে ব্যস্তভাবে উঠে বসল।

সুরপতি দেখল, তার এক হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে তয়ফাওয়ালি রশিদা খান। রশিদার অন্য হাতে একটি দীপ। তার সুন্দর মুখখানি এখন ক্রোধে কঠিন।

সুরপতি বলল, এ কী!

রশিদা বলল, পরদেশি, সত্য করে বলো তুমি কে?

সুরপতি রশিদার এই রূপান্তরের কোনও কারণই বুঝতে পারল না। হঠাৎ মধ্যরাত্রে এই রূপসী রমণী তার শিয়রের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কেন? উন্মাদ নয় তো?

সুরপতি বলল, আমি তো বলেইছি, আমি সামান্য একজন পথিক। আমার অন্য কোনও পরিচয় নেই।

রশিদা হিমশীতল কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করল, তুমি আমার কোন সর্বনাশ করতে এখানে এসেছ?

সুরপতি বলল, বেগম, আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি আপনার সর্বনাশ করব কেন? আপনি আমার এত উপকার করছেন, আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

সুরপতির হাতখানি আরও শক্ত করে ধরে, অন্য হাতের দীপটা কাছে এনে রশিদা জিজ্ঞেস করল, এই সবুজ পান্না বসানো অঙ্গুরীয় তুমি কোথায় পেলে?

সুরপতি চমকে উঠল। তৎক্ষণাৎ কোনও উত্তর দিতে পারল না।

রশিদা ক্রোধে চিৎকার করে বলল, চুপ করে রইলে কেন? বলো, কোথায় পেয়েছ? দুনিয়ায় এই অঙ্গুরীয় শুধু এক জনেরই হাতে থাকবার কথা।

সুরপতি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, আপনার নিশ্চয়ই কিছু ভুল হয়েছে। এ-রকম পান্না বসানো সাধারণ অঙ্গুরীয় অনেকেরই থাকতে পারে।

রশিদা বলল, সাধারণ! তোমার চক্ষু নেই? ভাল করে দেখো, এই সবুজ পাথরটির আকার একটি পদ্মফুলের মতো। এই পদ্মফুলটি আমার হৃদয়, তা আমি শুধু এক জনকেই দিয়েছিলাম। তুমি এটা কোথায় পেলে? বলল, সত্য করে বলো!

সুরপতি দেখল, পান্নাটির আকৃতি অনেকটা পদ্মফুলের মতোই বটে। আগে সেঠিক লক্ষ্য করেনি। এই অঙ্গুরীয় যে বিশেষ ভাবে নির্মিত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

সে বিনীত ভাবে বলল, আমি দরিদ্র পথিক, এ জিনিস আমার নিজস্ব নয়, তা সত্য। আমার চলার পথে পড়ে ছিল, লোভ সম্বরণ করতে পারিনি, কুড়িয়ে নিয়েছি।

পথে পড়ে ছিল? কোথায়?

অবন্তীপুর ছাড়িয়ে, কানসোনা প্রান্তরের মধ্যে।

মিথ্যা কথা।

রশিদা গলা চড়িয়ে ডাকলো, বাঁদি বাঁদি!

বাঁদি এসে দ্বারের কাছে দাঁড়াল। রশিদা বলল, সেগুলো নিয়ে আয়।

বাঁদি প্রায় তৎক্ষণাৎ ফিরে এল। তার হাতে সুরপতির পরিত্যক্ত ভিজে পোশাক এবং একজোড়া নাগরা।

সুরপতির সর্বাঙ্গে শিহরণ বয়ে গেল। রশিদা জিজ্ঞেস করল, এসব কার? তোমার নয়।

সুরপতি বিস্ফারিত চক্ষে বলল, হ্যাঁ, আমার।

শঠ। মিথ্যুক! এ-সব তোমার? বাঁদি চিনতে পারেনি, কিন্তু আমি দেখামাত্র চিনেছি। এই পোশাক, এই নাগরা, এই অঙ্গুরীয় -এইসব ইউনুস খাঁর। তুমি তাকে নিয়ে কী করেছ?

সুরপতি একটি বিরাট দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কোন দুষ্ট শনি তাকে বার বার এমন বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে! স্বর্ণকারের কাছে কেন সে দুটি অঙ্গুরীয়ই বিক্রয় করে দেয়নি তখন? কেন সে নতুন বস্ত্র কিনে মৃতের বস্ত্র পরিত্যাগ করে আসেনি?

সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বেগম, আপনাকে আমি সব সত্য কথা বলব। আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে। কিন্তু আপনি মন শক্ত করুন। আমার সব কথা শুনলে আপনি আঘাত পাবেন খুব।

সুরপতি সংক্ষেপে তার পূর্ব ইতিহাস বর্ণনা করল। তারপর বলল, এক সময় আমার অনেক কিছুই ছিল, কিন্তু ভাগ্যদোষে সব হারিয়েছি। শেষ পর্যন্ত আমার এমন দশা হল যে পরনের বস্ত্রখানি পর্যন্ত ছিল না। মানুষের তাড়া খেয়ে আমি লোকালয় থেকে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম শ্মশানে। এক সময় নিদ্রা ভেঙে দেখি, সেখানে একটি মৃতদেহ পড়ে আছে। একজন অতি সুপুরুষ যুবার দেহ। এখন বুঝতে পারছি সে-ই ইউনুস খা। যেহেতু মৃত ব্যক্তি কোনও সম্পত্তির মালিক হতে পারে না, সেই হেতু তার সম্পদ অন্য কেউ নিলে চুরি করা হয় না। আমি সর্বস্ব-বঞ্চিত, অসহায়, তাই মৃতের অঙ্গ থেকে তার বস্ত্র এবং অঙ্গুরীয় খুলে নিয়েছি। এটা আমি কিছু দোষের মনে করিনি। তারপর দৈবের কৌতুকে ঘুরতে ঘুরতে এসে আশ্রয় নিয়েছি আপনার গৃহে।

রশিদা বলল, ইউনুস খাঁ বেঁচে নেই?

তার সেই কণ্ঠস্বরে যেন নিখিল বিশ্বের হাহাকার ধ্বনিত হল। কম্পিত হল তার সারা দেহ। হাতের দীপ খসে পড়ল মাটিতে। বাঁদির কাঁধের ওপর মাথা লুটিয়ে সে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

সুরপতি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু পরে অশ্রুসিক্ত দুই চক্ষু তুলে রশিদা বলল, কিন্তু ইউনুস খাঁর শব হিন্দুর শ্মশানে পড়ে থাকবে কেন?

সুরপতি বলল, সে কথা আমি জানি না।

রশিদা ওড়নার প্রান্ত দিয়ে চক্ষু মুছে বলল, চলুন, আমাকে এখনি সেখানে নিয়ে চলুন। আমি নিজে তাকে বহন করে নিয়ে আসব। আমার চোখের জলে ধুইয়ে দেব তার শরীর। আমার এই দেহ হবে তার কাফ। আমরা এক সঙ্গে বেহস্ত-এ যাব।

সুরপতি আড়ষ্ট ভাবে বলল, ইউনুস খাঁর দেহ তো আর সেখানে নেই। শৃগাল-কুকুরে ছিঁড়ে খাবে এই ভয়ে আমি সেই দেহ নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছি।

মুসলমানের শব তুমি জলে ভাসিয়ে দিলে? মাটি খুড়ে কবরও দিতে পারোনি?

আমি তখন তো বুঝিনি।

এই সব তোমার ছলনা। তুমি অতি নিচ, শয়তান। তুমিই ওকে খুন করেছ। তুমি ওকে খুন করে সবকিছু কেড়ে নিয়েছ।

আপনি বিশ্বাস করুন আমি জীবনে কখনও কারুর ক্ষতি করিনি।

তোমাকে বিশ্বাস করব? তোমার এই অলীক কিস্যা দুনিয়ার কোন কাজি, কোন বিচারক বিশ্বাস করবে? তুমি হত্যাকারী।

সুরপতি সভয়ে নিজের বক্ষ চেপে ধরল। তার পোশাকের মধ্যে লুকোনো আছে সেই ছুরিকা। সেটা হঠাৎ দেখতে পেলে তো সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হবে।

সুরপতির একবার ইচ্ছা হল, পোশাকের মধ্যে থেকে ছুরিকাটি নির্গত করে সেই রমণীদু'টিকে ভয় দেখায়। এই দুই রমণীকে পর্যুদস্ত করা মোটেই শক্ত কাজ নয়। তারপর সে এখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যাবে। এরা আর তাকে ধরতে পারবে না।

কিন্তু এই চিন্তাটা মনে আসা মাত্র দ্বারের বাইরে গম্ভীর গলায় ব্যাঘ্রনিনাদ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল সুরপতি। সাংঘাতিক এক দ্বাররক্ষী রয়েছে, সামান্য একটা ছুরিকা নিয়ে সে কী করবে?

রশিদা খানম্ সুরপতির চক্ষে স্থির দৃষ্টি রেখে বলল, আমি তো তোমার কোনও ক্ষতি করিনি। সুন্দর, নিষ্পাপ ইউনুসও তো তোমার কোনও ক্ষতি করেনি। তুমি তুমি আমাদের এই সর্বনাশ কেন করলে? আমরা দুজনে দুজনকে ভালবেসে এক আলাদা দুনিয়া

গড়েছিলাম। ইউনুস আমার চোখের তারায় দেখত সারা আশমান, আমি তার চোখের তারায় দেখতাম অকুল দরিয়া, ইউনুসকে ভালবেসে আমি এই দুনিয়ার সবকিছু, এমনকী একটা পিঁপড়েকেও ভালোবাসতাম, সেই ইউনুসকে কেন তুমি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলে? কেন?

সুরপতিরও চোখে জল এসে গেল। সত্যিই যারা ইউনুসকে হত্যা করেছে, তারা মহা পাপিষ্ঠ। কিন্তু সে তো তার জন্য দায়ী নয়।

সে রশিদা খানমের হাত জড়িয়ে ধরে বলল, আপনি বিশ্বাস করুন, আমি হত্যাকারী নই, আমি এসবের কিছুই জানি না।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রশিদা খানম্ বলল, আমি ফৌজদারের কাছে নিয়ে গিয়ে তোমাকে ফাঁসিতে লটকাব। না না, তোমার সর্বাঙ্গ ছুরি দিয়ে চিবেলবণ মাখিয়ে দেব। না, তোমার দুই পায়ে শিকল বেঁধে বিপরীত ভাবে ঝুলিয়ে রাখব, তার চেয়েও ভাল, শের আলিকে তিন দিন অভুক্ত রেখে ছেড়ে দেব তোমার সামনে। ইউনুস, আমার ইউনুস।

রশিদা আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল বাঁদির কাঁধেব ওপর। বাঁদি তাকে ধরে আস্তে আস্তে নিয়ে গেল কক্ষের বাইরে।

পাথরের মূর্তির মতো সুরপতি দাঁড়িয়ে রইল ঘরের মাঝখানে।

সেইভাবে কেটে গেল দণ্ডপল। সুরপতি মাথার মধ্যে অসংখ্য চিন্তা ফেউয়ের মতো আছনে এসে পড়ছে। সে আর দিশা রাখতে পারছে না। কী কুক্ষণেই যে বৃষ্টি নেমেছিল। এই বাড়ির অলিন্দে আশ্রয় না নিলে এতক্ষণ সে চলে যেতঅনেক দূরে। সবই কুগ্রহ।

খানিকটা পরে সুরপতির ঘোর ভাঙল। এ-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না, একটা কিছু উপায় বার করতেই হবে। বাঁচতে তাকে হবেই, সে কিছুতেই হেরে যাবে না।

সে সন্তর্পণে দ্বারের কাছে এসে বাইরে উঁকি দিল। বৃষ্টি থেমে গেছে অনেকক্ষণ, বাইরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সে দ্বারের বাইরে এক পা বাড়াতেই দেখতে পেল হলুদ আগুনের টুকরোর মতো দুটো চোখ। তারপর একটা চাপা গর্জন।

সুরপতি সঙ্গে সঙ্গে কক্ষের মধ্যে চলে এসে দ্বার রুদ্ধ করে দিল। বাইবে প্রহরী রয়েছে শের আলি। সুরপতির পলায়নের কোনও উপায় নেই।

কক্ষে রয়েছে দুটি গবাক্ষ। অনেক উঁচুতে। সেখানে সুরপতিরস্বত পৌঁছয় না। এই কক্ষটি একটি কারাগার। সেখানে সুরপতি আবার বন্দি। তবে এবারে প্রভেদ এই, তারশয়নের জন্য রয়েছে পালঙ্কের ওপর নরম সজ্জা, তার অঙ্গে বহুমূল্য পরিচ্ছদ, তার আহার্যের জন্য রয়েছে অনেক ফলমূল।

পালঙ্কের ওপর বসে আরও কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর সুরপতি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। নিদ্রা সমস্ত সন্তাপহারিণী। তাই ইচ্ছে করেই যেন সুরপতি নিদ্রার মধ্যে ডুবে যেতে লাগল অনেক অনেক গভীরে।

সুরপতির যখন ঘুম ভাঙল, তখন প্রখর দিনের আলো এসে পড়েছে ঘরে।

প্রথমে সুরপতি মনেই করতে পারল না সে কোথায়। এ কার শয্যা? এ কার পোশাক তার শরীরে? তারপর সব মনে পড়ল। অমনি ভয়ে কেঁপে উঠল আবার।

দ্বার খোলার সাহস তার হল না। বাইরে নিশ্চয়ই শের আলি রয়েছে। এখান থেকে পালাবার উপায় কী?

কোনও উপায়ই মনে আসে না। কোনও একটি গবাক্ষ দিয়ে বাইরে বেরুবার চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু গবাক্ষ দুটিই এত ছোট যে, সেখান দিয়ে তার শরীর গলবে কিনা সন্দেহ।

পালঙ্কটা সরিয়ে সে নিয়ে গেল দেয়ালের ধারে। তার ওপর একটা কেদারা বসিয়ে তার ওপরে সুরপতি উঠে দাঁড়াল। সে ঠিকই সন্দেহ করেছিল, গবাক্ষ দিয়ে তার মাথা গলে না।

বাইরে দেখা যায় একটি মনোরম উদ্যান। সেখানে সাজি ভরে ফুল তুলছে এক রমণী। তার মুখ সুরপতি দেখতে পাচ্ছে না। সুরপতি এক দৃষ্টে চেয়ে রইল সে-দিকে।

একটু বাদে রমণীটি মুখ ফেরাতেই সুরপতি চমকে উঠল। রশিদা খান। কিন্তু তার মুখ এখন প্রফুল্ল হাস্যময়, সদ্য স্নানসিক্ত চুল, তাকে পবিত্র সুন্দর দেখাচ্ছে। সে গুন গুন করে গাইছে একটি গান।

সুরপতির সব কিছু অবিশ্বাস্য মনে হল। কাল যে রশিদা খানম্ অমন কান্নায় ভেঙে পড়েছিল, প্রিয়জনের বিচ্ছেদবেদনায় রিক্ত হয়ে গিয়েছিল, এক রাত্রির মধ্যে তার এতখানি রূপান্তর সম্ভব? এখন সে স্নান করে সেজেগুঁজে বাগানে এসে ফুল তুলতে তুলতে গান গাইছে? তাহলে কি কাল রাত্রির সব কিছুই অলীক? একটা দুঃস্বপ্ন?

এক সময় রশিদা খানমের সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল। সুরপতি চেঁচিয়ে বলল, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি অপরাধী নই। আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন।

গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে রইল রশিদা খান।

সুরপতি ওই একই কথা আবার বলল।

এবার রশিদা বলল, কে আপনি?

আমি সুরপতি।

কে সুরপতি?

আমি এক জন পথিক। কাল রাত্রে আমি...।

আপনি এখানে কী করে এলেন?

সুরপতি ভাবল, রশিদা খানম্ কি উন্মাদিনী? এখন তাকে চিনতেই পারছে না? অথবা শোকে দুঃখে ওর মস্তিষ্কে বিকার দেখা দিয়েছে?

রশিদা খানম্ এগিয়ে এল গবাক্ষর দিকে। তারপর নদীর বাঁকের মতো ভুরু দুটি তুলে বলল, এমন সকালবেলা আপনি চিৎকার করে ক্ষমা চাইছেন কেন? ক্ষমা কি কেউ মানুষের কাছে চায়? ক্ষমা চাইতে হয় খোদাতাল্লার কাছে।

সুরপতি বলল, আমি নিরপরাধ। আমি এখান থেকে মুক্তি চাই। একমাত্র আপনিই আমাকে মুক্তি দিতে পারেন।

রশিদা খান বলল, কে আপনাকে আবদ্ধ করে রেখেছে? বাইরে আসুন।

বাইরে শের আলি রয়েছে।

রশিদা খানম চুর্ণ হাসিতে ভেঙে পড়ল। হাসতে হাসতে বলল, আপনি শের আলিকে ভয় পান? ও তো একটা বিড়াল।

রশিদা খান সরে গেল সেখান থেকে। একটু পরেই দ্বারে শব্দ হল। সুরপতি সভয়ে দ্বার খুলে সরে দাঁড়াল দেওয়ালের পাশে।

দ্বার খোলার সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠল শের আলি, কিন্তু ভিতরে এল না। কিন্তু তার বদলে এল রশিদা খান। আজ সকালে তার রূপ যেন আরও ফেটে পড়ছে। গভীর কালোকুঞ্চিত কেশরাশির মধ্যে তার গৌরবর্ণ মুখখানি যেন একটি দুর্লভ ফুল। দেখা মাত্র যার ঘ্রাণ নিতে ইচ্ছে হয়।

রশিদা খানম্ জিজ্ঞেস করল, কে তুমি?

সুরপতি দীন কণ্ঠে বলল, আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না? কাল রাত্রে আপনি আমাকে–।

রশিদা খানম্ আর একটু এগিয়ে এসে বলল, কাল আমি সন্ধ্যা থেকেই ঘুমিয়ে ছিলাম। আমি কিছুই জানি না। আপনার মুখে এত দাড়ি কেন? আপনি কি ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন?

আমি নিতান্ত এক অভাজন। এই রকমই আমার বেশ।

আপনার অঙ্গে ইউনুস খাঁর পোশাক, অথচ মুখে দাড়ি। কিন্তু আপনি ইউনুস খাঁ নন, সে আপনার চেয়ে একটু খর্বকায়। আপনিও তো বেশ সুপুরুষ, বলিষ্ঠ দুটি হাত, প্রশস্ত বুক– এমন এক জন পুরুষ গৃহে এসেছে, অথচ আমি তা জানি না!

আপনার কিছুই মনে নেই?

কী মনে থাকবে?

আপনি আমাকে ভুল সন্দেহ করেছিলেন।

না না, আপনাকে আমি সন্দেহ করব কেন? আপনার মুখসুন্দর, চোখ সুন্দর, কথা সুন্দর– এমন মানুষকে কেউ সন্দেহ করে?

এমন সময় দ্বারের পাশে বাঁদি এসে ডাকল, বিবিসাহেবা?

রশিদা খানম্ মুখ ফিরিয়ে বলল, বাঁদী, এই মানুষটা কে রে?

বাঁদি বলল, ও কেউ নয়। আপনি ওপরে চলুন।

কেউ নয় কী রে? একটা জ্যান্ত মানুষকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, আর তুই বলছিস কেউ নয়?

আপনি ওপরে চলুন। মালিকানি আপনাকে ডাকছেন।

যাচ্ছি, যাচ্ছি। এই মানুষটা কে বল না? এই মানুষটাকে আমাকে দিবি? এই বলিষ্ঠ মানুষটাকে আমার চাই।

বাঁদি এসে তার হাত ধরে বকুনি দিয়ে বলল, শিগগির ওপরে চলুন। নইলে মালিকানি খুব রাগ করবেন।

বাঁদি প্রায় জোর করেই তাকে টেনে নিয়ে চলে গেল।

বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুরপতি। রশিদা খানম্ কি সত্যি গত রাত্রের সব কথা ভুলে গেছে? এ কখনও সম্ভব? বাঁদিই-বা ওকে জোর করে টেনে নিয়ে গেল কেন? মালিকানি আবার কে? কাল তো রশিদা খানম কেই মালিকানি বলেছিল বাঁদি!

একটু পরেই বাঁদি ফিরে এল এক বিচিত্র ভাবে হেসে সে বলল, শেঠ, খুব ধন্ধে পড়েছেন তো?

সুরপতি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল, তুমি আমাকে বাঁচাও। আমি তোমার ক্রীতদাস হয়ে থাকব।

বাঁদি বলল, আপনি ইউনুস খাঁকে হত্যা করেও এ গৃহ থেকে বেঁচে ফিরে যাবেন, তা কখনও হয়?

তুমি বিশ্বাস করো, আমি খুন করিনি। কেন আমি তাকে খুন করব, তার ওপর কি আমার কোনও রাগ আছে? আমি তো তাকে চিনিই না।

তাহলে ইউনুস খাঁর পোশাক আর অঙ্গুরীয় আপনার কাছে এল কী করে?

এগুলি আমি ইউনুস খাঁর শরীর থেকে খুলে নিয়েছি ঠিকই, কিন্তু তার আগেই কেউ তাকে খুন করেছিল। কে খুন করেছে আমি জানি না।

আপনার মিথ্যা কাহিনিও এত দুর্বল!

মিথ্যা নয়। তুমি বিশ্বাস করো, আমি যে-কোনও শপথ নিয়ে বলতে পারি।

আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কী আসে যায়!

রশিদা খানম্ তো সব কথা ভুলে গেছেন।

ও, আপনি বুঝি তাই ভেবেছেন? একটু আগে যে এসেছিল সেরশিদা খানম্নয়। আপনি চিনতে পারলেন না?

নিশ্চয়ই রশিদা খানম্! তাছাড়া আর কে?

এর বাম গণ্ডে একটা তিল ছিল দেখেননি? আমাদের মালিকানির শরীরে কোনও তিল নেই।

তিল? তিল আছে কি না আছে তা তো দেখিনি।

এঁর নাম রেশমি বিবি। রশিদা খানমের যমজ বোন। অনেক দিন থেকেই এর মাথার ঠিক নেই।

সুরপতি মাথায় হাত দিয়ে পালঙ্কে বসে পড়ল। এ কী অদ্ভুত কথা! মানুষে মানুষে এমন মিল হয়! এর কথা শুনে তো একে একটুও উন্মাদিনী মনে হল না।

বাঁদি আবার বলল, শেঠ, আপনাকে আমি সাবধান করে দিতে এসেছি। আপনি শের আলিকে ভয় পান, কিন্তু এই রেশমি বিবি বাঘিনীর চেয়েও সাংঘাতিক। পুরুষমানুষকে গিলে খায়। দেখবেন, ইনি আবার সুযোগ পেলেই এসে আপনাকে শাদি করতে চাইবেন।

সুরপতি বলল, আমি শাদি করব কী করে? আমার নিজের স্ত্রী আছে।

কথার মধ্যে সুরপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর অনেকটা আপন মনেই বলল, আমার স্ত্রী ছিল, পুত্র ছিল, এখন কোথায় আছে জানি না। তাদের সন্ধানেই যেতে চাই।

শেঠ, তবুআপনাকে সাবধান করে দিলাম। রেশমি বিবিকে এমনিতে দেখে কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু হঠাৎ যখন খেপে ওঠেন তখন কী যে সাংঘাতিক নিষ্ঠুর হন তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।

বাঁদি চলে গেল। সুরপতি আবার দ্বার বন্ধ করে বসে রইল একা। বেলা বাড়তে লাগল আপন মনে। বাইরে মাঝে মাঝে শের আলির ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা যায়। ওকে বোধহয় খাদ্য দেওয়া হয়নি। এই রকম তিন দিন ওকে ক্ষুধার্ত রাখা হবে, তারপর সুরপতিকে ওর সামনে...। দ্বার বন্ধ থাকলেও কি ওরা জোর করে ভেঙে ফেলবে দ্বার?

দিনের পর রাত এল। তারপর যখন রাত বেশ গভীর, সেই সময় তার দ্বারে শোনা গেল টকটক শব্দ। এ শব্দ শের আলির নয়, কোনও মানুষের।

সুরপতি প্রথমে ভাবল, দ্বার খুলবেনা। কিন্তু শব্দ হতেই লাগল। সেই শব্দের মধ্যে যেন একটা ব্যাকুল আহ্বান আছে। শুধু শুধু বসে থেকেই-বা লাভ কী! সুরপতি উঠে গিয়ে দ্বার খুলে দিল।

দ্বারের বাইরে দীপ হাতে এক সুন্দর রমণী। এ কে? রশিদা খান, না রেশমি বিবি?

সুরপতি জিজ্ঞেস করল, কে আপনি?

রমণী মৃদু হেসে বলল, আমাকে চিনতে পারছ না? আমি রশিদা খান।

সুরপতি, আমি তোমাকে মুক্তি দিতে এসেছি।

ঠিক সেই সময় সুরপতি সেই রমণীর বাম গণ্ডে একটা বড় তিল দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে সে পিছিয়ে এসে বলল, মিথ্যে কথা, আপনি রেশমি বিবি।

রমণী আরও বেশি হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে বলল, বাঁদি তোমাকে ভুল কথা বলেছে। বাম গণ্ডে তিল আছে রশিদা খানমের, রেশমি বিবির শরীরে কোনও তিল নেই। তুমি কি আজ সকালে তার গণ্ডে তিল দেখেছিলে?

সুরপতি একেবারে দিশেহারা হয়ে গেল। এরা কী সত্যিই দুই বোন? নাকি এক জনই এক-এক বার এক-এক নাম নিয়ে আসছে? বাঁদিইইচ্ছে করে তাকে ভুল বুঝিয়েছে? এরকম বেশিক্ষণ চললে সুরপতি নিজেই উন্মাদ হয়ে যাবে। এরা কি তাকে অত্যাচার করার এই নতুন কৌশল আবিষ্কার করেছে?

সে নতজানু হয়ে বলল, আপনারা আমাকে নিয়ে কী করতে চান? যদি মারতে চান, এক্ষুনি মেরে ফেলুন।

রমণী এগিয়ে এসে সুরপতির হাত ধরে কোমল কণ্ঠে বলল, ওঠো সুরপতি, তোমার কোনও ভয় নেই। মিথ্যা বলবনা, আমি রশিদা খানমনই, আমি রেশমি বিবি। তুমি আমার সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছ তো! আমি উন্মাদিনী, আমি বাঘিনীর চেয়েও সাংঘাতিক, আমি তোমাকে শাদি করতে চাইব –এ-সব শোনোনি? আমার মুখের দিকে চেয়ে সত্যি কথা বলো তো, আমাকে এ-রকম সাংঘাতিক মনে হয়?

সুরপতি নিঃশব্দে দু'দিকে মাথা নেড়ে জানাল, না।

এটা তার সত্য অনুভূতি। রেশমি বিবিকে দেখে কিছুতেই ভয়ঙ্করি মনে হয় না। নিষ্পাপ সরল মুখ। মস্তিষ্ক বিকৃতির কোনও লক্ষণই নেই। বাঁদি এর নামে মিথ্যা অপবাদ দিতে পারে অনায়োস।

রেশমি বিবি বলল, পাছে লোকজনের কাছে নিজের কদর কমে যায়, তাই আমার বোন রশিদা খান আমাকে বাইরে যেতে দেয় না। লোকসমাজে রটিয়ে দিয়েছে আমার মস্তিষ্ক ঠিক নেই।

সুরপতি চুপ করে রইল।

হঠাৎ রেশমি বিবির চোখ সজল হয়ে এল। কম্পিত স্বরে বলল, ওরা রটনা করে, সুন্দর চেহারার পুরুষমানুষ দেখলেই আমি তাকে প্রলোভন দেখিয়ে শাদি করতে চাই। তারপর তাকে মেরে ফেলি। এ যে কত বড় মিথ্যা! পরদেশি, তোমাকে আমি সত্য কথা বলি আমি খুব ভালভাবেই জানি, কোনও দিন কোনও পুরুষ আমাকে গ্রহণ করবে না। আমাকে সম্পূর্ণভাবে দেখলেই ঘৃণায় দূরে সরে যাবে।

সুরপতি বিস্মিত ভাবে বলল, ঘৃণা! এমন রূপসী রমণীকে কেউ ঘৃণা করতে পারে? আপনাকে দেখলে তো সন্ন্যাসীরও চিত্তবিচলিত হবে।

রেশমি বিবিবলল, না, আমি রূপসীনই। আমি কুৎসিত। অনেক সময় কোনও বান্দবিকেও সুন্দর পোশাকে মুড়ে রাখলে ভাল দেখায়। আমি হচ্ছি সেই রকম। তুমি দেখবে?

রেশমি বিবি একটানে তার বুকের বসন উন্মুক্ত করে ফেলল। সুরপতি লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছিল, কিন্তু এক পলক দেখেই তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, এ কী।

রেশমি বিবির অনাবৃত বুকের ঠিক মাঝখানে পূর্ণচন্দ্রের আকারের একটা গোল কালো দাগ। তার সুগঠিত বর্তুল দুই স্তনও কালো। রেশমী বিবির সর্বাঙ্গ অত্যন্ত ফর্সা, মাঝখানে এই কালো দাগ হঠাৎ ভয় পাইয়ে দেয়।

সুরপতি চোখ সরাতে পারল না। স্থির দৃষ্টিতে সে-দিকে চেয়ে রইল। অস্ফুট স্বরে বলল, এমন কখনও দেখিনি।

রেশমী বিবি বলল, এবার আমাকে ঘৃণা হচ্ছে তো?

সুরপতি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না না, ঘৃণা নয়। আপনি তবু সুন্দরী, এ-রকম কখনও দেখিনি, তবু মনে হচ্ছে এতে আপনার রূপ অনেক বেড়ে গেছে, পৃথিবীতে আপনার মতো আর কেউ নেই, কিন্তু এরকম কী করে হল?

রেশমি বিবি নিজের বক্ষে হাত রেখে বলল, আসমান থেকে অভিশাপ এসেছিল, আজ থেকে আট বছর আগে, সন্ধ্যাবেলা আমি একটা গোলাপবাগে একা দাঁড়িয়েছিলাম, চাঁদের আলোয় চারদিক ভেসে যাচ্ছিল, এমন সময় কে যেন আমার নাম ধরে ডাকল। আমি চমকে উঠে বললাম, কে? চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম কোথাও কেউ নেই। তবে কে ডাকল আমাকে? স্পষ্ট শুনেছিলাম। আমার সে-দিন খুব মন খারাপ ছিল, আমি এক জন সঙ্গী চাইছিলাম, কেউ আসেনি আমার কাছে। মনে হল, কেউ যেন আমাকে দেখছে। চারদিকে কেউ নেই, তবু যেন আসমান থেকে কেউ দেখছে আমাকে এক দৃষ্টে। আমি আসমানের দিকে চেয়ে রইলাম। বললাম, তুমি কে? এসো এসো। কেউ এল না। হঠাৎ আশমানে প্রচণ্ড শব্দ হল আর একটা বিজলি হানল। আমি খুব জোরে কেঁপেউঠেস্থির হয়ে গেলাম, মনে হল আমি মরে গেছি। তুমি বাজে-পোড়া গাছ দেখেছ? আমি ঠিক সেই রকম দাঁড়িয়ে রইলাম প্রহরের পর প্রহর। সকালবেলা লোকজন এসে আমাকে ধরে নিয়ে যায়। আমি মরিনি, বিজলিতে আমার বুক পুড়িয়ে দিয়ে গেছে, তবু আমি মরিনি। সেদিনই আমি বুঝেছিলাম, আমি খোদাতাল্লার না-পসন্দ, কোনও পুরুষমানুষও আমাকে চাইবেনা। সবাই আমাকে ঘৃণা করবে।

সুরপতি বলল, কেউ আপনাকে ঘৃণা করবে না। যে-কোনও পুরুষমানুষ আপনাকে মাথায় করে রাখবে।

রেশমি বিবি আরও কাছে এগিয়ে এসে ব্যগ্র ভাবে বলল, তুমি– তুমি? তুমি আমাকে ঘৃণা করবে না?

সুরপতি বলল, আপনি এত সুন্দর, আপনি সকলের চেয়ে সুন্দর।

রশিদা খানমের থেকেও?

হ্যাঁ। আপনার মতো আর কেউ নেই।

প্রমাণ দাও, তুমি আমার বুকে হাত রাখো, দেখি তোমার ঘৃণা হয় কি না।

বিবিসাহেবা, আমি একজন সামান্য মানুষ।

প্রমাণ দাও?

সুরপতি তার কম্পিত হাত রেশমি বিবির বুকে রাখল। কী নরম, কী স্নিগ্ধ।

আঃ কী শান্তি। আমার যে হৃদয় পুড়েছে তা কেউ দেখেনি। তুমিই শুধু দেখলে। তুমি মহান।

তারপর রেশমি বিবি সুরপতির হাত চেপে ধরে বলল, চলো, তুমি আর আমি এখান থেকে পালিয়ে যাই।

কোথায়?

যে-দিকদুচোখ যায়। তুমি আমি কোনও নির্জন বনের মধ্যে একঝরনার ধারে থাকব। আমাদের আর কেউ দেখবে না। শুধু তোমার জন্য আমি আর আমার জন্য তুমি। চলল, এখনি চলল।

সুরপতি নিজে যে বিবাহিত, তার যে প্রিয়তমা পত্নী আছে, সেকথা এই সময় তার মনে এল না। পলায়নের চিন্তায় সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। কাক্ষর পাইরে পা দিতে গিয়েও সে বলল, কিন্তু শের আলি যে পাহারায় আছে।

রেশমি বিবি অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, ও কিছু করবে না। ও আমার হুকুম শোনো।

দু'জনে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল অলিন্দে। শের আলি সেখানে নেই। সমস্ত গৃহটি নিস্তব্ধ। প্রাঙ্গণ পার হয়ে ওরা বাইরের দিকে আসতেই দেখল মূল দ্বারের কাছে দুটি চক্ষু জ্বলছে। চাপা গর্জন করে শের আলি ছুটে এল সে-দিকে।

শের আলি সুরপতিরওপরে ঠিকঝাঁপিয়ে পড়ত, তার আগেই রেশমি বিবি এসে পড়ল মাঝখানে।

শের আলিকে দু'হাত ধরে ফেলে সে বলল, যা, এখন যা।

শের আলি রেশমি বিবির গায়ে মাথা ঘষতে লাগল।

রেশমি বিবি বলল, তুমি দ্বার খুলে ফেলে বাইরে দাঁড়াও, আমি আসছি।

রেশমি বিবি শের আলিকে আদর করে বলল, যা যা, ভেতরে যা! এ আমার দোস্ত, একে কিছু বলবিনা।

শের আলিকে নিরস্ত করে রেশমি বিবি যেই দ্বার পেরিয়ে পথের ওপর এসেছে, অমনি শের আলি লাফ দিয়ে দ্বার ডিঙিয়ে পথের ওপর এসে পড়লল। সে সুরপতিকে আক্রমণ করার আগেই রেশমি বিবি আবার তার মুখ ধরে ফেলে বলল, তোকে যেতে বললাম না! যা, যা-আচ্ছা, তোকে আদর করে দিচ্ছি।

রেশমি বিবি মুচকি হেসে বলল, তোমার সঙ্গে যাচ্ছিকিনা, তাই ওরঈর্ষা হয়েছে। ও আমাকে খুব ভালবাসে।

তারপর সে শের আলির মুখ চুম্বন করল, দু'হাতে আদর করতে লাগল তাকে। সেই হিংস্র ব্যাঘ্রও নখ গুটিয়ে নিয়ে তার থাবা বোলাতে লাগল রেশমি বিবির সর্বাঙ্গে। রেশমি বিবি খল খল করে হাসতে লাগল। একবার সে মুখ তুলে সুরপতির দিকে তাকিয়ে বলল, কী, তোমার আবার ঈর্ষা হচ্ছে না তো?

সুরপতি উত্তর দেবেকী, তার সমস্ত অনুভূতি যেন অসাড় হয়ে গেছে। এ-রকম কাণ্ড সে কখনও দেখেনি। ব্যাঘ্র ও মানবী সম্পূর্ণ প্রণয়লীলা চালাচ্ছে।

একটু পরে রেশমি বিবি উঠে দাঁড়িয়ে পোশাকের ধুলো ঝেড়ে শের আলির মুখে এক চাপড় মেরে বলল, এবার যা!

শের আলি এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে সুরপতির দিকে। সেখাবে না। সেই চাহনি দেখে সুরপতির রক্ত-চলাচল থেমে যাবার উপক্রম হল। এই ব্যাঘ্র তাকে নিষ্কৃতি দেবে না।

রেশমি বিবি বলল, আমি কখনও কখনও ওর পৃষ্ঠে চড়ে বেড়াতে যাই তো, তাই ও অপেক্ষা করছে। আজ যাবেনা রে, আজ তুই ফিরে যা। আচ্ছা, এই একর বসছি। তারপর ফিরে যাবি তো?

শের আলি, আমি আমার দুলহ পেয়ে গেছি, আর কোনও দিন তোর সঙ্গে যাবনা!

রেশমি বিবি ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে চেপে বসল। তার কাঁধের কাছে চাপড় মেরে বলল, এবার হয়েছে তো? এই শেষ বার।

শের আলি সুরপতির দিকে তাকিয়ে একবার চাপা গর্জন করল, তারপর বিরাট লম্ফ দিল সামনে দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটল। রেশমি বিবিকে পৃষ্ঠে নিয়ে সে প্রায় কয়েক পলকের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। মাত্র দু-একবার রেশমি বিবির কণ্ঠ শোনা গেল, থাম, থাম– তারপর মিলিয়ে গেল শব্দ।

সুরপতি বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। কোথায় গেল? কখন আসবে? সুরপতি কি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে? কতক্ষণ?

কিন্তু মুক্তির চিন্তায় সুরপতির আবার চেতনা ফিরে এল। সে এখন মুক্ত, স্বাধীন। সে এখন যেখানে খুশি যেতে পারে। গৃহের দ্বি-তলের একটি গবাক্ষ খুলে গেল না?

আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে সুরপতি সামনে দিকে ছুটল। একবার সে ভেবেছিল, কিছুদুর গিয়ে বোধহয় রেশমি বিবির দেখা পাবে। কিন্তু কোথাও কোনও চিহ্ন নেই।

বেশ কিছু দূর আসবার পর সুরপতি দেখল পথটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। একটা পথ গেছে বনের দিকে, অন্যটি নগরে। রেশমি বিবিকে নিয়ে কোন দিকে গেছে শের আলি? বনের প্রাণী নিশ্চয়ই বনের দিকেই যাবে। সুরপতি কি বনের মধ্যে দিয়ে রেশমি বিবিকে খুঁজবে? কিন্তু শের আলির হিংস্র চোখ দু'টির কথা মনে পড়তেই তার বুকে কেঁপে উঠল। সে বুঝতে পারল, শের আলি কিছুতেই রেশমি বিবিকে তার সঙ্গে যেতে দেবে না।

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অস্ফুট স্বরে বলল, বিদায় রেশমি বিবি।

তারপর নগরের দিকে ছুটল প্রচণ্ড জোরে, অন্ধের মতো। মুক্তির আনন্দ তার পায়ে অনেক দ্রুত গতি এনে দিয়েছে। তবু অন্ধকাবের মধ্যে সে আচমকা ধাক্কা খেয়ে একবার পথের ওপর লুটিয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল।

এক প্রহর বাদে ক্ষীণভাবে জ্ঞান ফিরে এল সুরপতির। এবারও তার মনে হল, কে যেন তার মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে। তার চুলের মধ্যে কার যেন নরম হাত। তবে কি রেশমি বিবি ফিরে এসেছে? শের আলিকে ত্যাগ করে আবার খুঁজে পেয়েছে তাকে?

সুরপতি জিজ্ঞেস করল, কে, রেশমি বিবি?

উত্তর এল, না, আমি সুভদ্রা।

সুভদ্রা! সুরপতি অমনি সর্বশক্তি দিয়ে উঠল কিন্তু কোথায় সুভদ্রা? সুভদ্রাও নেই, রেশমি বিবিও নেই। সে পথের ওপর একলা পড়ে আছে।

৬. পান্থশালায় বিশ্রাম

সে-রাত্রে সুরপতি সম্মুখবর্তী এক পান্থশালায় বিশ্রাম নিল। আবার বেরিয়ে পড়ল পরদিন খুব সকালেই। দ্রুত সে এই এলাকা ছাড়িয়ে যেতে চায়। এবার সে আর কোনও ভুল করবে না, কথা বলবে না কোনও অচেনা ব্যক্তির সঙ্গে, আশ্রয় নেবে না কোনও গৃহে। ঝড়-বৃষ্টি-মহাপ্লাবন যাই আসুক, সে শুধু অগ্রসর হবে দারুকেশরের দিকে।

একবার সে ভাবল, দাড়িগোঁফ মুণ্ডন করে ফেলবে। কিন্তু একটু পরেই সেমত পরিবর্তন করল। এই দাড়িগোঁফই এখন তার ছদ্মবেশ। নইলে দারুকেশ্বরে আবার যদি কেউ তাকে বংশীলাল বলে ভুল করে।

তার কাছে এখনও কিছু অর্থ আছে, তার খাদ্যাভাব হবে না। পান্না বসানো অঙ্গুরীয়টি সে আঙুল থেকে খুলে কোমরের কাছে গুঁজে রাখল। তারপর তিন দিন তিন রাত্রি সমানে পদব্রজের পর সে পৌঁছল দারুকেশরে।

সুরপতি নগবে প্রবেশ করল বিপরীত দিক দিয়ে। এদিক দিয়ে সেই সরাইখানার পথ খুঁজে পাওয়া শক্ত। তবুএকসময় সে এসে পৌঁছল রাজবৈদ্য বাসবদত্তের প্রাসাদের সামনে। এখানে থেকে তার আর পথ চিনে নিতে ভুল হবে না।

বাসবদত্তের প্রাসাদের সামনে যথারীতি অসংখ্য লোকের ভিড়। সকলেই কী একটা বিষয় নিয়ে গুঞ্জন করছে। সুরপতি একটু কাল দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনল।

লোকেরা বলাবলি করছে যে, রাজবৈদ্য বাসবদত্ত নিজে গুরুতর রকমের অসুস্থ। প্রতি দিন তার অবস্থার অবনতি হচ্ছে। দেশে আর এমন কোনও বৈদ্য নেই যে বাসবদত্তের চিকিৎসা করতে পারে। বাসবদত্ত অন্য কোনও চিকিৎসককে তার কাছেই ঘেঁষতে দেবেন না। তিনি ঘোষণা করেছেন যে, তার মৃত্যু রোধ করার ক্ষমতা কারুর নেই। এই অবস্থাতেও কিন্তু বাসবদত্ত রোগী দেখেন। এক সময় তাকে ধরাধরি করে ওপর তলা থেকে নিচে

নামানো হয়। রোগীদের মধ্য থেকে তিনি বেছে মাত্র তিন-চার জনকে নিদান দেন। এবং এখনও তিনি ধন্বন্তরি। তার ওষুধে মুমূর্ষও খাড়া হয়ে ওঠে। এখন কথা হচ্ছে, রোগীদের মধ্যে কোন তিন-চার জন সে-রকম ভাগ্যবান।

সুরপতি রাজবৈদ্য বাসবদত্তের জন্য একটু দুঃখ বোধ কবল। যে-কোনও কারণেই হোক এই বিস্ময়কর মানুষটি সম্পর্কে তার একটা শ্রদ্ধাবোধ আছে। হায়, একবার এঁর চোখে পড়লেই সুভদ্রা সেরে উঠত। সুভদ্রা কি এখনও সেই রকম আছে?

সুরপতি বিষণ্ন মনে ধীর পায়ে হাঁটতে লাগল। সবাইখানাটি আর বেশি দূর নয়। তবু সেখানে যেতে সুরপতির এখন ভয় করছে। কী দেখবে সেখানে গিযে? যদি সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমাব ইতিমধ্যে--!

সুরপতি বার বার থেমে যাচ্ছে, তবু এক সময় সে এসে পৌঁছল সরাইখানার সামনে।

সরাইখানাটি নতুন রঙ করা হয়েছে। সামনের আস্তাবলে অনেকগুলি বলবান অশ্ব বাঁধা। মনে হয় ওই সবঅশ্ব সৈনিক পুরুষদের। ভিতরে বেশ একটা সবব উৎসব চলছে মনে হয়। সুরপতিব গা ছম ছম করে উঠল। সব কিছুই কেমন যেন নতুন নতুন মনে হয়।

যে-ঘরটায় সুরপতিদের থাকতে দেওয়া হয়েছিল, সুরপতি আস্তে আস্তে সেই ঘরটির সামনে এসে দাঁড়াল। তক্ষুনি সেখান থেকে বর্মচর্মপরা দুজন সৈনিকপুরুষ বেরিয়ে এল, সুরপতির প্রতি সন্দেহজনক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তারা প্রশ্ন করল, মহাশয়ের কী চাই?

সুরপতি একটু সংকুচিত হয়ে পড়ল। বিনীতি ভাবে বলল, আমি বলভদ্রের সঙ্গে দু'একটি কথা বলতে এসেছিলাম।

বলভদ্র কে?

সুরপতি বিস্মিত ভাবে বলল, এইসরাইখানার মালিক!

মালিকের নাম তো জীবক। সে আবার বলভদ্র হল কবে থেকে?

সৈনিক দু'টি অবশ্য সুরপতিকে নিয়ে আর কালক্ষেপ করল না। তারা ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।

সুরপতি হতভম্ব হয়ে গেল। এ আবার কী? বলভদ্রকে এরা কেউ চেনে না? জীবক আর বলভদ্র কি এক?

সে আর ভেতরে প্রবেশ করল না। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এল। সেকারুর মনে কোনও রকম সন্দেহের উদ্রেক করতে চায় না।

সরাইখানার বাইরে একটি কলাইয়ের দোকান আছে। এই কশাইকে সুরপতি আগেও দেখেছে।

সে কশাইয়ের দোকানের পাশে একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর এক সময় নিরালা দেখে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করল, ভাই, এইসরাইখানার মালিক কি বলভদ্র নয়?

কশাই সুরপতিকে একটুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করল। তারপর বলল, আপনি বুঝি অনেক দিন পর এদিকে আসছেন?

সুরপতি বলল, হ্যাঁ, পাঁচ-ছ'বছর পর হবে অন্তত।

কশাই বলল, এই সরাইখানা এক সময় বলভদ্রেরই ছিল বটে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, দু-দুবার এই সরাইলুটপাট হয়ে যায়। জানেন না, ইদানীং দলভ্রষ্ট পাঠান-মোগল সৈনিকদের উৎপাত বড় বেড়েছে।

সুরপতি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, বলভদ্র আর নেই?

সে এই সরাইখানা বিক্রি করে দিয়ে চলে গেছে। শুনেছি, নগরীর উত্তর দিকে সে নতুন এক সরাইখানা খুলেছে।

কোন পথ দিয়ে সেদিকে যেতে হয়?

এই পিপুল গাছের পাশ দিয়ে যে-পথ, সেই পথ দিয়ে সোজা চলে যান, সামনে দেখবেন রাজপুষ্করিণী, তার দক্ষিণ দিক দিয়ে আবার রাস্তা –

সুরপতি তখুনি চলে যাচ্ছিল, আবার ফিরে এল। সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারের কথা কি এই কশাই জানে? অত দিন আগেকার কথা কি এর মনে থাকবে?

তবু সে জিজ্ঞেস করল, ভাই, আর একটি কথা–এই সরাইখানাতে কি কোনও স্ত্রীলোক আর শিশু–।

কশাই তাকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, ভদ্র না পণ্যা?

ভদ্র রমণী, সঙ্গে একটি শিশু।

এখান এত সৈনিকের উৎপাত, এখানে কোনও ভদ্র রমণী থাকতে পারে? কেউ নেই। সৈনিকরা রাত্তিরের দিকে কিছু স্ত্রীলোক নিয়ে আসে বটে, কার ঘরের সর্বনাশ করে কে জানে। আমি সামান্য লোক, সে-খবর জানি না।

সুরপতি আর আপেক্ষা করল না। সে এক প্রকার ছুটতেই লাগল। বলভদ্রের সন্ধান পেলেই একমাত্র সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারের কথা জানা যাবে।

খানিক দূর এসে সে বিশাল রাজপুষ্করিণী দেখতে পেল। এবার এর দক্ষিণ দিকে রাস্তা। সেদিকে যেতে গিয়েও সে একটি বৃক্ষের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল।

বৃক্ষের গায়ে একটি ইস্তাহার ঝুলছে। তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা–

বংশীলাল! বংশীলাল! কুখ্যাত অপরাধী এবং কারা-পলাতক বংশীলালকে যে বা যারা জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় রাজসরকারে উপস্থিত করতে পারবে, তাকে বা তাদের এক সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে।

সুরপতির গায়ে একটা শিহরণ বয়ে গেল। সে বংশীলাল নয়, কিন্তু বংশীলালের নামে ওই ঘোষণা দেখে মনে হল যেন তারই মৃত্যুদণ্ড। জীবিত অথবা মৃত। না, জীবিত অবস্থায় কেউ আর তাকে কারাগারে নিয়ে যেতে পারবে না।

সুরপতি নিজের মুখে হাত বোলাল। এত দাড়িগোঁফ ভেদ করে কেউ আর তাকে বংশীলাল বলে মনে করবে না। সে শুনেছে, বংশীলালের রোগা পাতলা চেহারা। সে-তুলনায় সুরপতি এখন অনেক সবল স্বাস্থ্যবান।

বংশীলালের সঙ্গে কি তার কোনও দিন দেখা হবে? মনে হয় যেন নিয়তিতে কোথাও বাঁধা আছে যে, একদিন সে বংশীলালের মুখোমুখি দাঁড়াবে, সব বোঝাঁপড়া হবে সেদিন।

দক্ষিণের রাস্তা দিয়ে এক ক্রোশ আসার পর সুরপতি দেখতে পেল একটি সরাইখানা। এটাই কি বলভদ্রের? হঠাৎ ভিতরে প্রবেশ না করে সুরপতি ভাবল, আগে একটু অনুসন্ধান করা যাক।

এইসরাইখানার সামনে একটি ছোট কুঠরিতে থাকে এক জন ক্ষৌরকার। সুরপতি তার সামনে গিয়ে কোনও প্রশ্ন করতে যাবে, এমন সময় সরাইখানা থেকে বেরিয়ে এল একটি নদশ বছরের বালক।

সুরপতির চিনতে এক মুহূর্ত দেরি হল না। তার পুত্র ধ্রুবকুমার।

৭. ধ্রুবকুমারকে কোলে তুলে

সুরপতি তক্ষুনি সব কিছু ভুলে ধ্রুবকুমারকে কোলে তুলে যাচ্ছিল, কিন্তু তা আর হল না।

বালকটি নিজেই দৌড়ে এল এ-দিকে। সুরপতির দিকে ভ্রুক্ষেপও করল না। ক্ষৌরকারের সামনে এসে দাঁড়াল।

সুরপতির নিজেকে সংযত করে রাখল কোনওক্রমে। তার এই বিশাল দাড়িগোঁফ সমন্বিত চেহারা দেখে চিনতে পারবে না ধ্রুবকুমার। হঠাৎ ভয় পেয়ে যাবে।

ধ্রুবকুমার ক্ষৌরকারকে সম্বোধন করে বলল, আপনাকে একবার বাবা ডেকেছেন।

সুরপতির মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। বাবা? ধ্রুবকুমারের আবার বাবা কে?

ক্ষৌরকার বলল, ডেকেছেন? কেন, সকালেই যে তোমার বাবার ক্ষৌরি করে দিয়ে এলাম?

ধ্রুবকুমার বলল, আমার ভাইয়ের হাতে বড় বড় নখ হয়েছে। সে নিজেই নিজের গাল আঁচড়ে ফেলেছে। তাই বাবা বললেন, আপনাকে ডেকে ওর নখ কেটে দিতে।

সুরপতি আবার আঘাত পেল। ভাই? ধ্রুবকুমারের আবার ভাই কোথা থেকে এল? তবে কি এই বালকটি ধ্রুবকুমার নয়? কিন্তু সেইমুখ, সেই চোখ! এ কখনও ভুল করা যায়?

ক্ষৌরকার একটু পরে যাবে শুনে বালকটি আবার দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে সরাইখানায় ঢুকে গেল। সুরপতি এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

তারপর মুখ ফিরিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, ভাই ক্ষৌরকার, এই বালকটির নাম কী?

ক্ষৌরকার বলল, সকলে তো ওকে ধ্রুব বলেই ডাকে।

সুরপতি আবার জিজ্ঞেস করল, এই সরাইখানার মালিক কে?

ক্ষৌরকার বলল, তুমি নতুন লোক বুঝি? এইসরাইখানার মালিক বলভদ্রকে কে না চেনে?

সুরপতি আর কোনও বাক্য উচ্চারণ করতে পারল না। সেখানেই মূর্জিত হয়ে পড়ে গেল। একটা পাথরে মাথা ঠুকে রক্ত বেরুতে লাগল তার কপাল থেকে।

ক্ষৌরকার লোকটি বৃদ্ধ। সামান্য একটা চালাঘরে সে বহুকাল ধরে এখানে বাস করে আসছে। ত্রি-সংসারে তার কেউ নেই। এই নগরীর খানিকটা অংশ ব্যতীত বাইরের পৃথিবীর কোনও সংবাদই সে রাখে না। এবং তারই চালাঘরের দরজার কাছে এক জন অচেনা বলশালী লোকের হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার মতো ঘটনা তার জীবনে বেশি ঘটে না।

প্রথমে সে ভাবল, সুরপতি মারা গেছে। সে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল শুধু। মানুষ জন্মায় ও মরে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এক জন অচেনা লোক মারা গেছে বলে সে তো তার কাজ বন্ধ রাখতে পারে না। সে তার ক্ষুরে শান দিচ্ছিল, আবার তেমনিই শান দিতে লাগল।

খানিকটা বাদে সে আবার চোখ তুলে দেখল, সুরপতিরকপাল থেকে তখনও তাজা রক্ত গড়াচ্ছে।

ক্ষৌরকার শুধু এইটুকু জানে যে, কোনও মরা মানুষের শরীর থেকে তাজা রক্ত বেরোয় না। রক্ত জিনিসটা জীবিত মানুষেরই সম্পদ। এই রক্ত বন্ধও করা যায়।

সে সুরপতির কপালে খানিকটা জল ঢেলে দিয়ে সেখানে ফিটকিরি ঘষতে লাগল। তাতেও রক্ত বন্ধ হয় না। তখন সে খানিকটা ঘাস ছিঁড়ে এনে ক্ষতস্থানে চেপে ধরল।

যন্ত্রণায় সুরপতির জ্ঞান ফিরে এল। সে অস্ফুট গলায় বলল, মা!

ক্ষৌরকার বলল, হায় রে মাতৃহীন! এই নিঃস্বের ঘরে তুমি মাকে খুঁজতে এসেছ? বরং কোনও দেবালয় গেলে না কেন?

সুরপতি বলল, আমি কোথায়?

ক্ষৌরকার জিজ্ঞেস করল, তুমি কে হে বাপু? কোথা থেকে এসেছ? তোমার মুখভর্তি দাড়িগোঁফের জঙ্গল। তুমি যদি আমার কাছে ক্ষৌরকার্যের জন্য এসে থাকো, তাহলে বলল, আমি তা এখনই করে দিচ্ছি।

সুরপতি চোখ মেলে দেখল, ক্ষৌরকারের বার্ধক্য কুঞ্চিত মুখ তার মুখের কাছে ঝুঁকে আছে। তার এক হাতে তখনও ক্ষুর ধরা।

সুরপতি বলল, আমার দাড়ি কাটবার দরকার নেই। তুমি আমার গলাটা এক পোঁচে কেটে দাও। বাঁচার সাধ আমার মিটে গেছে।

ক্ষৌরকার বলল, এ-রকম অদ্ভুত কথা আমি কখনও শুনিনি! এ-জন্য তুমি আমার কাছে এসেছ কেন? রাজপথে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো, কোনও সৈনিকপুরুষ দেখলে রাজার নামে কিছু নিন্দা উচ্চারণ করো, তারা আরও অনেক সহজে তোমার মুণ্ডু উড়িয়ে দেবে। তুমি যন্ত্রণাও টের পাবে না।

সুরপতি উঠে বসে জিজ্ঞেস করল, রাজার নামে কী নিন্দা উচ্চারণ করব বলো তো?

ক্ষৌরকার বলল, অনেক অনেক রকম কথা বলে। তবে আমার কাছে রাজার একটাই দোষ। আমাদের রাজা মাকুন্দ, তার দাড়িগোঁফ নেই। সুতরাং আমার কাছে এমন রাজা থাকা না-থাকা সমান।

সুরপতি বিস্মিত হয়ে গেল। এমন সরল কথা সে বহু দিন শোনেনি।

ক্ষৌরকার বিড় বিড় করে আপন মনে বলতেই লাগল, এই রাজা আমার কোন উপকারে লাগছে? তবে একথা আমি প্রকাশ্যে জানাতে পারি না, কারণ আমি এখনও আমার এই বৃদ্ধ মুণ্ডুটিকে ভালবাসি। তুমি ভালবাসোনা?

সুরপতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, না। জীবনের আনন্দ আমার শেষ হয়ে গেছে।

ক্ষৌরকার বলল, মৃত্যু অতি সহজ। বেঁচে থাকাই বড় শক্ত কাজ, এই বয়েসে আমি এখনও সেই শক্ত কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

সুরপতি বলল, আমি আর পারছি না।

ক্ষৌরকার বলল, আর একটু পরেই রাজপথ দিয়ে সৈনিকেরা টহলে বেরুবে। তুমি যাও, আর দেরি কোরো না।

সুরপতি বলল, আমি উঠে দাঁড়াতে পারছি না। আমার পায়ে জোর নেই। চোখেও ঝাঁপসা লাগছে। একটু বিশ্রাম করি আগে।

সামনেই সরাইখানা। সেখানে যাও, আরামের শয্যা পাবে। সুন্দর বিশ্রাম হবে।

তার বদলে আমি তোমার শয্যায় যদি একটু শুয়ে থাকি? তুমি শুতে দেবে একটু?

তুমি হঠাৎ এ-রকম অজ্ঞান হয়ে পড়লে কেন? তোমার কি মৃগী ব্যাধি আছে?

আগে তো ছিল না। তবে একবার আমার মাথায় একটা সাংঘাতিক চোট লাগার পর এ-রকম হয়েছে। আমার বড় কষ্ট হচ্ছে এখন। একটু শুয়ে থাকতে দেবে তোমার শয্যায়?

ক্ষৌরকার একটুক্ষণ চিন্তা করল। তার শয্যা বলতে এক টুকরো চট ও একটা মলিন বালিশ। সেখানে আর একটা লোক এসে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলে কী আর এমন ক্ষতি? তবু একটা লোক এ-রকম বিচিত্র প্রস্তাবই-বা দেয় কেন? সব জিনিসেরই তো মাথা-মুণ্ডুথাকবে।

সে বলল, কিন্তু ভাই, তোমাকে আমি শুতে দেব কোন সুবাদে? তুমি আমার কে?

সুরপতি তার কুর্তার জেল থেকে একটা স্বর্ণমুদ্রা বাব করে ক্ষৌরকারের হাতে দিয়ে বলল, এটা তুমি রাখো। এক দিন না এক দিন আমি ঠিক তোমাকে দিয়ে ক্ষৌরকার্য করাব। এটা তার আগাম দক্ষিণা। সুতরাং এখন আমি তোমার ভাবী খরিদ্দার হয়ে গেলাম।

ক্ষৌরকার এই যুক্তিটা বুঝল। স্বর্ণমুদ্রাটি সে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল। বিড় বিড় করে বলতে লাগল, জীবনে কেউ আমাকে কখনও স্বর্ণমুদ্রা দেয়নি। এটা আমি গলায় ঝুলিয়ে রাখব। ওহে বিদেশি, তুমি এসো, ভিতরে এসো।

সেই দিন থেকে সুরপতি সেই ক্ষৌরকারের জিনিসপত্র ধুয়ে দেয়, তার রান্না করে দেয়, নদী থেকে জল আনে। আর একটু অবসর পেলেই সে সরাইখানার দিকে তাকিয়ে থাকে।

সরাইখানার সামনে একটা গোল চত্বর। সেখানে কয়েকটি কাঠের চৌকি পাতা। বাইরের লোক এসে ওখানেই প্রথমে বসে। অনেকে ওখান থেকেই খাবার-দাবার খেয়ে নিয়ে চলে যায়। আবার যারা ভেতরে কক্ষ ভাড়া নিয়েছে, তারাও সন্ধ্যার দিকে ওখানে বসে মজলিশ জমায়। সরাইখানাব মূল বাড়িটি পাথরের। বলভদ্র বেছে বেছেই এই সরাইখানাটি কিনেছে, যাতে সহজে আর আগুন না লাগে। দ্বি-তলের একটি ঘরের জানলা সব সময় বন্ধ থাকে। সুরপতি জেনেছে ওই ঘরেই থাকে সুভদ্রা। তাকে কখনও দেখা যায় না।

এর মধ্যে ধ্রুবকুমারের সঙ্গে একটু একটু ভাব হয়েছে সুরপতির। ধ্রুবকুমার তাকে চিনতে পারেনি। ধ্রুবকুমারের ছোট ভাইটিকেও সে দেখেছে। তার মুখখানি অবিকল বুধনাথের মতো। সেই শিশুটির বয়েস হিসেবকরেও সুরপতি বুঝেছে যে, এ সেই বুধনাথেরই বলাৎকারের সন্তান। এক-এক সময় সুরপতির এমন অসহ্য রাগ হয় যে তার ইচ্ছে হয়, আদর করার ছলে সে শিশুটিকে ঘাড় মুচড়ে মেরে ফেলে। সুভদ্রার গর্ভে বুধনাথের সন্তান, এ যে তার চোখের বিষ!

পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলে নেয়। অবোধ কোমল শিশু, এর তো কোনও দোষ নেই! এর জন্মের জন্য তো এ নিজে দায়ী নয়!

তবে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে ধ্রুবকুমারকে। তার জন্য সে পাখি ধরে দেয়, গাছের ডাল ভেঙে খেলনা তৈরি করে। সুরপতি এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে পারছে না শুধু ধ্রুবকুমারের টানে। এ যে রক্তের টান।

সুভদ্রার কথা সে অনেক বার ভেবেছে। এখন যদি সে বলভদ্রের কাছে গিয়ে সুভদ্রার স্বামী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে বলভদ্র কি ফিরিয়ে দেবে না সুভদ্রাকে? বলভদ্র এমনি মানুষটা খারাপ নয়। এই কদিনে তার ব্যবহার দেখে, কথাবার্তা শুনে সুরপতি বুঝেছে, মানুষটার মধ্যে মায়া দয়া আছে। দুটি সন্তান সমেত সে সুভদ্রাকে আশ্রয় দিয়েছে, এটাও কম কথা নয়।

কিন্তু সুভদ্রাকে নিয়ে সুরপতি যাবে কোথায়? তার সহায় সম্বল নেই, আর এক কপর্দকও সঞ্চয় নেই, সে তো কোথাও নতুন করে সংসার পাততে পারবে না। এক হয়, যদি তমলুকে আবার ফিরে যাওয়া যায়। সেখানে রোগের উপদ্রব নিশ্চয়ই এত দিনে থেমে গেছে। কোনও রকমে খুব কষ্ট করেও সেখানে একবার পৌঁছতে পারলে কিছু একটা গতি হয়ে যাবে। কিন্তু সেখানে এই কুলটা রমণীকে নিয়ে সে সমাজে বাস করবে কী করে? সুভদ্রা একবার দস্যুদ্বারা ধর্ষিতা হয়েছে, সে তো না হয় নিজের অনিচ্ছায়, কিন্তু তারপর তো সে এতগুলো বছর পরপুরুষের ঘর করেছে! কথাটা মনে পড়লেই যেন সুরপতির বুকটা একেবারে পুড়ে যায়। সেই সুভদ্রা–যার ধ্যান জ্ঞান সব কিছুই ছিল সুরপতিকে কেন্দ্র করে, কোনও দিন অপর পুরুষের দিকে চোখ তুলে তাকায়নি পর্যন্ত।

সুভদ্রার কথা চিন্তা করে এত কষ্ট করেও জীবনধারণ করেছে সুরপতি। কারাগার থেকে পলায়ন করেছে কত ঝুঁকি নিয়ে। তার পরও কত রকম বিপদ আসে, তবু সে এখনও বেঁচে আছে, সে নিছক মনের জোরে। সবই সুভদ্রার জন্য। সেই সুভদ্রা তার জন্য অপেক্ষা করতে পারল না?

সুরপতি তো অন্য কোথাও থেকেও যেতে পারত। রেশমি বিবির মতো রমণীর আহ্বানও সে পেয়েছিল। আর কিছু না হোক, সে তত সন্ন্যাসী হয়ে পাহাড়ে যেতে পারত। কিন্তু সুভদ্রার কথা এক মুহূর্তের জন্যও সে ভোলেনি। এখন এত কষ্ট করে ফিরে এসেও সে দেখল, সুভদ্রা আর তার নয়। তার নিজের পুত্র তাকে বাবা বলে চিনতে পারে না।

তবু সুভদ্রার ওপর ঠিক রাগ করতে পারে না সুরপতি! মনটা আবার কোমল হয়ে যায়। সুভদ্রার মতো নারী নিশ্চয়ই স্বেচ্ছায় এমন হয়নি। সুভদ্রার ওপর রাগ করলে তো সুরপতি এখনও যে-কোনও দিন এখান থেকে চলে যেতে পারে। কিন্তু তা সে পারে না।

প্রথম দিন সরাইখানায় ঘুম থেকে জেগে সুভদ্রা নিশ্চয়ই ভেবেছিল যে, সুরপতি তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। সুরপতি আর ফিরে আসেনি বলে সেই ধারণাটাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারপর পুত্রসন্তান নিয়ে সুভদ্রা চরম অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছিল, নিশ্চয়ই খুব সহজে সে আত্মসমর্পণ করেনি বলভদ্রের কাছে। ক্ষুধার জ্বালায়, বিশেষ করে শিশুপুত্রের মুখ চেয়েই বোধহয় সে শেষ পর্যন্ত বেছে নিয়েছে এই কলঙ্কের জীবন।

সুভদ্রা, ধ্রুবকুমারকে এখানে ফেলে রেখে অন্য কোনও জায়গায় চলে যেতেও তার মন চায় না। অথচ নিজের স্ত্রী-সন্তানকে ফিরিয়ে নেবারও কোনও উপায় নেই। অন্তত সুভদ্রাকে সে যদি একবার চোখের দেখাও দেখতে পেত।

সুরপতি ধ্রুবকুমারের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে জিজ্ঞেস করে, বাছা, তোমার মা কি কখনও বাইরে বেরোন না?

ধ্রুবকুমার বলে, না। মা বাইরে আসতে চান না। যদি দুষ্ট লোকেরা মাকে ধরে নিয়ে যায়?

সুরপতি আবার জিজ্ঞেস করে, তোমার মা বুঝি খুব সুন্দর?

ধ্রুবকুমার বলে, আমার মা পৃথিবীর সব চেয়ে সুন্দর মা!

আচ্ছা ধ্রুবকুমার, লোকে নাকি বলে, তোমার মা বোবা! উনি কথা বলতে পারেন না।

ধ্রুবকুমার রেগে গিয়ে উত্তর দেয়, কে বলেছে? দুষ্ট লোকেরা এ-কথা বলে।

তোমার মা তাহলে কথা বলতে পারেন?

হ্যাঁ, মা তো রোজ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন। তবে শুধু আমাদের সঙ্গে কথা বলেন, অন্য কারুর সঙ্গে কথা বলেন না।

তোমার বাবার সঙ্গেও কথা বলেন না?

না।

তারপর একটু থেমে ফিস ফিস করে ধ্রুবকুমার বলে, উনি তো আমার বাবা নন। আমার বাবা তো দূরে বিদেশে চলে গেছেন।

সুরপতি আর চোখের জল সামলাতে পারে না। কান্নায় তার বুক ভিজে যায়। কোনও রকমে মুখটা অন্য দিকে সরিয়ে রাখে যাতে ধ্রুবকুমার দেখতে না পায়। তার সন্তান অন্তত তাকে মনে রেখেছে। সে আর কখনও অন্য লোককে বাবা বলবে না। তবু সে সন্তানের কাছে নিজের পরিচয় দিতে পারছে না! ধ্রুবকুমারকে একলা সে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু সুভদ্রা? সুভদ্রাকে সে এত দিন পরে কী করে ফিরিয়ে নেবে? তাছাড়া লজ্জায়, পাপের ভয়ে সুভদ্রা হয়তো এখন আর তার কাছে ফিরে আসতেও চাইবেনা।

একটুক্ষণ পরে সে আবার ধ্রুবকুমারকে জিজ্ঞেস করে, তোমার বাবাকে তোমার মনে আছে?

ধ্রুবকুমার সুর করে টেনে উত্তর দেয়, হ্যাঁ-।

তোমার বাবা তোমাদের ফেলে কেন দূর বিদেশে গেছেন?

তা আমি জানি না। মা জানেন।

মা কিছু বলেন না তোমাদের?

না, বাবার কথা জিজ্ঞেস করলেই মা কাঁদতে থাকেন। তাই আর জিজ্ঞেস করি না।

আমার কি মনে হয় জানো? তোমার বাবা বোধহয় কোনও রাজার কারাগারে বন্দি হয়েছিলেন, তাই তোমাদের খোঁজ নিতে আসতে পারেননি। তোমার মাকে একটা কথা জিজ্ঞেস কোরো তো। তোমরা যদি খবর পাও, কোনও রাজার কারাগারে তোমার বাবা বন্দি হয়ে আছেন, তাহলে তোমরা কি তাকে উদ্ধার করতে যাবে?

ধ্রুবকুমার দর্পের সঙ্গে বলল, নিশ্চয়ই যাব। আমি যাব।

যদি তোমাদের এই বাবা, মানে সরাইখানার মালিক বলভদ্র যেতে না দেন?

আমি তবু একা যাব। তলোয়ার নিয়ে লড়াই করব।

তবু কথাটা তোমার মাকে একবার জিজ্ঞেস কোরো। আমার কথা কিছু বোলোনা, এমনি জিজ্ঞেস কোরো, কেমন?

সুরপতি আবার অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখের জল লুকোয়।

৮. প্রশ্নের উত্তর

কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর সুরপতির পাওয়া হল না। তার আগেই আর একটি ঘটনা ঘটে গেল।

সে-দিন তখন নিদারুণ দ্বিপ্রহর। রৌদ্রের তেজে পথঘাট একেবারে ফাঁকা। সেই সময়েই একজন অশ্বারোহী এসে থামল সরাইখানার সামনে। অশ্বারোহীটি বেশ সুপুরুষ, মাথায় বিশাল পাগড়ি বাঁধা।

সরাইখানার চত্বরে ঢুকে সে একটা চৌকিতে বসল। তারপর পাগড়িটা খুলে হাওয়া খেতে খেতে বলল, কে কোথায় আছ হে? এক পাত্র জল নিয়ে এসো!

সেই চত্বরের এক পাশে একটি বড় পেয়ারা গাছ। ধ্রুবকুমার তখন সেই গাছে চড়ে পেয়ারা পাড়ছিল। গাছের ওপর থেকেই সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, বাবা!

সেই ডাক শুনে ক্ষৌরকারের চালাঘরে বসে চমকে উঠল সুরপতি। ধ্রুবকুমার তো বলভদ্রকে এ-রকম ভাবে বাবা বলে ডাকে না। বাইরে এসে সে দেখাল, ধ্রুবকুমার গাছ থেকে নেমে এসে দৌড়ে গিয়ে একটি লোককে জড়িয়ে ধরে আনন্দে চিৎকার করছে, বাবা –বাবা এসেছে। আমার বাবা এসেছে।

চৌকিতে বসে থাকা লোকটিকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল সুরপতি। অবিকল তার যৌবনের চেহারা, ঠিক যেন তার একটি প্রতিবিম্ব বসে আছে ওখানে। ধ্রুবকুমার তো ভুল করবেই।

সুরপতির চিনতে এক মুহূর্ত দেরি হল না। এই তবে সেই বংশীলাল। বংশীলালের দাড়িগোঁফ কামানো, চকচকে চেহারা, বেশ একটা শৌখিনতার ভাব আছে। এই সেই নটবর চূড়ামণি। লোকটার সাহস আছে, এ-রকম দিনের বেলা সে প্রকাশ্যে ঘুরতে পারে এখানেও।

ধ্রুবকুমারের চিৎকার শুনে বেরিয়ে এসেছে বলভদ্র। সে-ও স্তম্ভিত হয়ে গেছে। একটুক্ষণ পরে সে বলল, তুমি ফিরে এসেছ, এত দিন পর। কেন এসেছ? দূর হয়ে যাও।

বংশীলাল কোনও কথা বলল না। সে অতি চতুর লোক, প্রথমেই কিছু ভুল বলে না ফেলে ব্যাপারটা বুঝে নিতে চায়।

বলভদ্র হুকুম করল, ধ্রুবকুমার, যাও ভেতরে যাও!

ধ্রুবকুমার বলল, না, আমি যাব না। আমার বাবা এসে গেছে মা, মা, মা, এসে দেখো বাবা এসেছে।

এত দিন পর দ্বি-তলের সেই বন্ধ কক্ষটির একটি জানলা ফট করে খুলে গেল। সুরপতিও ততক্ষণে সরাইখানার চত্বরে এসে দাঁড়িয়েছে। সে আর বংশীলাল এক সঙ্গে দেখল সুভদ্রাকে। এতগুলি বছরেও সুভদ্রার সেই রূপ একটুও ম্লান হয়নি।

সুন্দরী রমণী দেখে বংশীলালের চোখ চক চক করে উঠল। এতক্ষণ সে ধ্রুবকুমারের চিৎকারে কোনও মনোযোগ দেয়নি, এবার সে দক্ষ অভিনেতার মতো কণ্ঠস্বর কম্পিত করে বলল, এসোবৎস, তোমাদের জন্যই তো আমি এত কাল পরে ফিরে এসেছি!

সুরপতির শরীরের রক্ত চলাচল যেন থেমে গেছে। এক সঙ্গে দুটি চরম উত্তেজক ব্যাপার তার সহ্য হচ্ছে না। এত দিন পর সে সুভদ্রাকে দেখল। সেই চোখ, সেই ওষ্ঠ! একরাশ কালো চুলের মধ্যে সুভদ্রার ফরসা মুখখানি দেখে মনে হয় ঠিক যেন এক অপ্সরী, এই মাটির পৃথিবীতে বন্দি হয়ে আছে।

সুরপতি সুভদ্রার নাম ধরে ডাকার চেষ্টা করল। কিন্তু গলা দিয়ে কোনও শব্দ বেরোল না। সুভদ্রা তার দিকে তাকায়নি। সে এক দৃষ্টিতে বংশীলালকে দেখছে।

বংশীলালকে দেখেও সুরপতি কম বিহ্বল হয়নি। এই সেই লোক, যার জন্য বিনা অপরাধে সুরপতিকে এত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। জীবনের কতগুলি মূল্যবান বছর নষ্ট হয়ে গেছে তার। এই বংশীলালের জন্যই সে নিজের স্ত্রী-পুত্রকে হারিয়েছে।

এই বংশীলাল এখন এসেছে তার বাকি জীবনটাও বিড়ম্বিত করতে। সে এখন সুভদ্রাকে হরণ করতে চায়।

বংশীলাল লুব্ধের মতো কয়েক বার সুভদ্রার দিকে তাকাল। তারপর দু'হাত উচ্চে তুলে বলল, দেখো, আমি এসেছি! আমি ফিরে এসেছি। আমি মরিনি।

সুভদ্রা এখনও নিঃশব্দ, কোনও উত্তর জানাল না বংশীলালকে।

বংশীলাল ধ্রুবকুমারকে কোলে তুলে নিয়ে বলল, আমি ফিরে এসেছি, আর কোনও ভয় নেই।

তারপর বলভদ্রের দিকে ফিরে বলল, ভাই, তুমি যে আমার স্ত্রী-পুত্রকে এত দিন আশ্রয় দিয়েছ সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এবার এদের সব ভার নেব।

বলভদ্র তিক্ত গলায় বলল, এবার এদের ভার তুমি নেবে? নির্লজ্জ, কাপুরুষ! এক সময় এদের ফেলে পালিয়েছিলে কেন? স্ত্রীর জন্য চিকিৎসক ডাকার নাম করে ভোররাত্রে চুপি চুপি কেন পালিয়েছিলে? তখন এদের কথা মনে পড়েনি? একটি কানাকড়িও সম্বল রেখে যাওনি এদের জন্য!

বংশীলাল তাকে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করে বলল, সেসব কথা পরে বলব। আমার দারুণ বিপদ হয়েছিল।

বলভদ্র গর্জে উঠে বলল, পরে নয়, এখুনি সব কথা হয়ে যাক। কোন অধিকারে তুমি এদের ওপর দাবি জানাতে এসেছ?

বংশীলাল মৃদুহাস্য করে বলল, স্বামীর অধিকারে। পিতার অধিকারে। সে-অধিকার নষ্ট হয় না।

বলভদ্র বলল, যে-স্বামী তার স্ত্রীকে অসহায় অবস্থায় রেখে পলায়ন করে, তার আবার অধিকার কী? যে-পিতা তার পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের কথা ভাবে না, সে আবার কী-রকম পিতা? তুমি এখান থেকেশীঘ্র দূর হও। আমার ক্রোধ জাগ্রত হবার আগে তুমি আমার চোখের সামনে থেকে সরে যাও।

বংশীলাল এ-কথায় ভয় পেল না। সুভদ্রার মতো সুন্দরী রমণী সে আগে কখনও দেখেনি। এমন নারীরত্ন দৈবাৎ পেয়ে গিয়ে সে কিছুতেই ছাড়বেনা। সেমিষ্টভাবে বলল, অত রাগকরছ কেন ভাই? নিশ্চয়ই কোনও গুরতর কারণ ঘটেছিল, তাই আমি ফিরে আসতে পারিনি এত দিন। এখন তো এসেছি, এখন আর আমি দেরি করতে পারছি না, অধীর হয়ে পড়েছি, তুমি আমাকে সুভদ্রার কাছে যেতে দাও।

দাঁড়াও।

কেন আমাকে বাধা দিচ্ছ?

তোমার লজ্জা করছেনা? তুমি এমন ভাব করছ যেন সব কিছুই স্বাভাবিক আছে। সুভদ্রার ওপরে তোমার চেয়ে আমার অধিকার অনেক বেশি। তুমি যে-দিন ওদের পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলে, সেদিন থেকে সুভদ্রা অনশন নিয়েছিল।

এই সময় সুভদ্রার ঘরের জানলা আবার রুদ্ধ হয়ে গেল। সকলেই সেদিকে তাকাল একবার।

বলভদ্র আবার বলল, হ্যাঁ, অনশন নিয়েছিল সুভদ্রা। আমি অনেক বুঝিয়েও তাকে অনুগ্রহণ। করাতে পারিনি। সে কারুর দয়ার দান গ্রহণ করবে না। শিশুপুত্রটি কাঁদছিল, তবু সুভদ্রা ভ্রূক্ষেপ করেনি। তিন দিন এইভাবে থাকার পর সুভদ্রা বুঝেছিল যে, তুমি আর

ফিরবে না। তোমার অনুসন্ধানে আমি নিজে লোক পাঠিয়েছিলাম চতুর্দিকে। কেউ তোমার সন্ধান আনতে পারেনি। তুমি এ রাজ্য ছেড়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলে, সেকথা সুভদ্রাকে জানাতে, সে শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে পাগলিনীর মতো পথে বেরিয়ে পড়েছিল। কেউ তাকে ফেরাতে পারেনি, বেশ কিছু দূর গিয়ে সে পথের মধ্যে পুড়ে যায়। তার শরীর অসুস্থ, তার ওপর উপবাসের দুর্বলতা, এই অবস্থায় সে হাঁটবে কী করে? আমি প্রথম থেকে তাকে আশ্রয় দিতে চেয়েছি বিনাশর্তে। সে রাজি হয়নি। শেষ পর্যন্ত আমি তার শিশুপুত্রকে কেড়ে নিয়ে এসেছিলাম। সিংহিনী যেমন তার শাবককে ছেড়ে থাকে না, সেই রকম সুভদ্রা তার সন্তানের টানে আবার ফিরে এসেছিল সরাইখানায়। আমার আশ্রয়ে।

বংশীলালের চোখ দিয়ে কৃত্রিম অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। সে বলল, ভাই, তুমি যে উপকার করেছ, সারা জীবনে কীভাবে সেই ঋণ শোধ করব তা জানি না। তবু যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করব।

বলভদ্র বলল, তোমার ঋণশোধের তোয়াক্কা আমি করি না। আমি এদের আশ্রয় দিয়েছি, আমার নিজের অন্তরের টানে। আমি এই শিশু আর তার জননীকে নিজের বলে গ্রহণ করেছি। আমি জানতাম না সুভদ্রা দ্বিতীয় বার অন্তঃসত্ত্বা। তবু আমি তার বিন্দুমাত্র অযত্ন করিনি। তুমি এমনই পাষণ্ড যে নিজের গর্ভিণী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতেও তোমার বিবেকে আটকায়নি। সুভদ্রার জন্য আমি কত ক্ষতি সহ্য করেছি, তুমি জানো! এই দারুকেশ্বরে সব চেয়ে বড় সরাইখানার মালিক ছিলাম আমি। সুভদ্রা যখন সুস্থ হয়ে উঠল, তার রূপআবার খুলে গেল, তখন সেই রূপের লোভে শৃগালেরা ঘোরাফেরা করতে লাগল দিন-রাত। সুভদ্রাকে কেড়ে নেবার অনেক চেষ্টা করেছে কামুকেরা। আমি বুক দিয়ে ওদের আগলেছি। দিবারাত্রি প্রহরা দিয়েছি। আমার সরাইখানায় দু-দু'বার ওরা অগ্নিসংযোগ করেছে, তবু আমি সুভদ্রাকে অন্য কারুর হাতে তুলে দিইনি। তাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি এখানে। আমি আজও সুভদ্রার ওপর বলপ্রকাশ করিনি একদিনও, শুধু তার করুণা চেয়েছি।

বংশীলাল বলল, ভাই, আমার স্মৃতিভ্রংশ হয়েছিল। এক সাধুর আস্তানায় আমি গিয়েছিলাম সুভদ্রার জন্য ঔষধ আনতে।

সুরপতি স্তম্ভিত হয়ে সরাইখানার দ্বারের পাশে দাঁড়িয়ে এ-সব শুনছে। জালিয়াৎ বংশীলালের দুঃসাহসের কোনও সীমা নেই। এত অনর্গল মিথ্যা সে বলতে পারে! কিন্তু এখনও যদি তাকে জেরা করা যায়, সে ধরা পড়ে যাবে। সুভদ্রার পূর্ব-পরিচায় সে কিছুই জানে না। বস্তুত সুভদ্রা সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। সুভদ্রার শরীরের কোথায় কোথায় তিল আছে, সে-প্রশ্ন করলেই সে নির্বাক হয়ে যাবে। সে অতি চতুর, বলভদ্রকে রাগিয়ে দিয়ে সে পূর্ব-কথা সব শুনে নিচ্ছে। এখনও যদি সুরপতি ওর সামনে গিয়ে প্রশ্ন করে–।

কিন্তু সুরপতিকে কে চিনবে? ধ্রুবকুমার পর্যন্ত তার পিতাকে চিনতে পারেনি। সুভদ্রাও যদি তাকে এই বেশবাসে চিনতে না পারে? সুভদ্রা কি বংশীলালকেই সুরপতি ভাবছে?

আর দেরি করলে মহা সর্বনাশ হয়ে যাবে। অতি ধূর্ত বংশীলাল নিজের স্মৃতিভ্রংশের কথা তুলেছে, ওই একযুক্তিতে সেসব পুরনো কথা অস্বীকার করতে পারে। সে যদি সুভদ্রার ওপর নিজের স্বামীত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, বলভদ্র কি আটকাতে পারবে? হাকিমের কাছে গেলে বলভদ্রই তিরস্কৃত হবে।

আর সময় নেই। সুরপতি দৌড়ে ফিরে এল ক্ষৌরকের আস্তানায়। ওঠো, ওঠো! তোমাকে সেই স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলাম মনে আছে? আজ তার হিসাব মেটাও। আমার চুল-দাড়ি সব কেটে দাও।

ক্ষৌরকার চোখ মেলে বলল, এত ব্যস্ততার কী আছে? তুমি কি বিবাহ কবতে যাচ্ছ নাকি? সুরপতি তাকে ঝাঁকানি দিয়ে বলল, হ্যাঁ, তাই যাচ্ছি। আব এক মুহূর্তও সময় নেই।

ক্ষৌরকার বলল, তোমার মতো সহায়সম্বলহীনকে কে বিবাহ করবে হে? দারুকেশরের পাত্রীরা এত শস্তা তো নয়!

সুরপতি তাকে তুলে বসিয়ে দিয়ে বলল, কোনও পাত্রীর সঙ্গে নয়, আমার বিবাহ হবে মৃত্যুর সঙ্গে। শীঘ্র করো।

ক্ষৌরকার সুরপতির চুল হেঁটে, দাড়িগোঁফ নির্মূল করে দিল সযত্নে। তারপর সুরপতির মুখে নিজ শিল্পকীর্তির দিকে তাকিয়ে সে বলল, তোমার মুখখানি তো মন্দ নয়! মৃত্যু নিশ্চয়ই পছন্দ করবে তোমাকে।

সুরপতি লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষৌরকারের হাত থেকে ক্ষুরটি কেড়ে নিল। তাকে আর কোনও বাক্য উচ্চারণ করতে না দিয়ে সে ছুটে গেল সরাইখানার দিকে।

বংশীলাল তখন জোর করে সরাইখানার দ্বি-তলে ওঠার চেষ্টা করছে। বলভদ্র বাধা দিচ্ছে তাকে। বংশীলালের মুখ থেকে এতক্ষণে বিনয় ও কৃতজ্ঞতার ভাব খসে পড়েছে। সে রুক্ষভাবে বলভদ্রকে ধাক্কা দিয়ে বলছে, লম্পট, তুমি আমার স্ত্রীকে ভোগ করতে চাও? যদি এখনও তুমি সরে যাও, তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারি। নইলে হাকিমকে দিয়ে তোমাকে শূলে চড়াব।

সুরপতি পিছন থেকে ছুটতে ছুটতে এসে চিৎকার করে বলল, দাঁড়াও।

বলভদ্র আর বংশীলাল দু'জনেই সেই চিৎকার শুনে ঘুরে দাঁড়াল। দু'জনেরই মুখ গোলাকার হয়ে গেল। তারা যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না।

বলভদ্রই বলল, এ কে?

বংশীলাল বলল, এ নিশ্চয়ই কোনও প্রতারক। আমার চেহারার মতো রূপসজ্জা করে এসেছে।

সুরপতি আর বংশীলাল মুখোমুখি দাঁড়াল। এক বিচিত্র হাস্য ফুটে উঠল সুরপতির ওষ্ঠে। তার জীবনের এক অশুভ চক্র যেন আজ সম্পূর্ণ হল। এক দিন এই বলভদ্রের সরাইখানায়

এসে প্রথম দাঁড়াবার পর তাকে বংশীলাল বলে ভুল করা হয়েছিল। তারপর থেকে তার জীবনটাই বদলে গেল।

সুরপতি বলল, এবার?

বংশীলাল বলল, এ জীবনে কত কিছুই দেখেছি, কিন্তু এমন বিচিত্র দৃশ্য কখনও দেখিনি। কে তুমি ওস্তাদ? আমারই প্রতিচ্ছবি হয়ে কোথা থেকে এলে?

সুরপতি জিজ্ঞেস করল, আমাকে চিনতে পারছ না?

বংশীলাল ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, না, আমি নিজেকে এখনও চিনি না। চেনার চেষ্টাও করি না।

সুরপতি ধারালো ক্ষুরটা উঁচুতে তুলে ধরে বংশীলালকে বলল, নরাধম, আজ তোর সব পাওনা মিটিয়ে দিতে এসেছি।

বংশীলাল তবু ভয় না পেয়ে বলল, তুমি কে? তুমি কি কোনও প্রেতাত্মা? তুমি কি আমার মনেরই কোনও অন্ধকার রূপ? তুমি অলীক?

সুরপতি বলল, তোমার রক্তের ফোয়ারায় যখন আমি হাত ধোবো তখন তুমি বুঝবে আমি কে। তুমি এ জীবনে যত পাপ করেছ, তার শাস্তিভোগ করতে হয়েছে আমাকে। এবার আমার হাত থেকেই নাও তোমার শেষ শাস্তি।

বংশীলাল তার কটিবন্ধ থেকে ছুরিকাটি বার করারও সময় পেল না। তার আগেই ক্ষুর নিয়ে সুরপতি লাফিয়ে পড়ল তার ওপর। ফালা ফালা করে ফেলল বংশীলালের গলা। সত্যিই ফোয়ারার ধারার মতো রক্ত ফিনকি দিয়ে লাগল সুরপতির হাতে।

বংশীলাল বলল, এবার তাহলে গেলাম। সেটাই বংশীলালের শেষ কথা। নির্বাক প্রস্তরমূর্তির মতো দণ্ডয়মান বলভদ্রকে স্পর্শ করে সুরপতি বলল, আমাকে প্রথম দিন

দেখেই তুমি বংশীলাল বলে ভুল করেছিলে। আজ সত্যিকারের বংশীলালকে দেখেও তুমি চিনতে পারলে না?

বলভদ্র অস্ফুট কণ্ঠে বলল, এ বংশীলাল!

সুরপতি বলল, কোনও সন্দেহ নেই।

তাহলে তুমি কে?

আমি সুরপতি। তুমি বংশীলালের মৃতদেহটি রাজদরবারে নিয়ে যাও। জীবিত বা মৃত অবস্থায় তাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারলে এক সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা করা আছে। সেই পুরস্কার তুমি নাও। আমি আমার স্ত্রীর কাছে যাচ্ছি।

এই সময় দ্বি-তলের কক্ষ থেকে তীক্ষ্ণ আ-আ-আ শব্দ হল। তারপর মনে হল, কেউ পড়ে গেল ভূমিতে।

বলভদ্র বলল, এ তো সুভদ্রার গলা। এ তো সুভদ্রার চিৎকার।

সুরপতি বলল, তোমার আগে আমি ওই কণ্ঠস্বর চিনেছি।

বলতে বলতে সে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল।

ঘরের দ্বার ভিতর থেকে বন্ধ।

সুরপতি প্রাণপণ শক্তিতে সৈই দ্বারে ধাক্কা দিল।

ততক্ষণে বলভদ্রও সেখানে উঠে এসেছে। ধ্রুবকুমার মা মা বলে চিৎকার করছে।

সুরপতি বলভদ্রকে বলল, তুমি আমাকে এই দ্বার ভেঙে ফেলতে সাহায্য করো। করবে না?

দু'জনের মিলিত ধাক্কায় দ্বার ভেঙে পড়ল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। ঘরের মধ্যে দেখা গেল, সুভদ্রা নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে মেঝের ওপরে। তার পাশে একটি বিষের কৌটো।

বলভদ্র হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল। ধ্রুবকুমার ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মায়ের বুকে। শুধু সুরপতি চঞ্চল হল না। সে নিচু হয়ে ঝুঁকে সুভদ্রার ওষ্ঠ ও অধর ফাঁক করে দেখল। সুভদ্রার জিহ্বায় তখনও বিষের সাদা সাদা গুড়ো লেগে আছে। তখনও উত্তাপ আছে সুভদ্রার শরীরে।

সুরপতি উন্মত্তের মতো চিৎকার করে বলল, এখনও সময় আছে! আমি বাঁচাব, আমি সুভদ্রাকে বাঁচাব। আমি এমন ভাবে সব কিছু ব্যর্থ হতে দেব না।

সুভদ্রার দেহটা পাঁজাকোলা করে নিয়ে সে ছুটল। এই পৃথিবীতে মাত্র এক জন ব্যক্তিই আছেন, যিনি সুভদ্রাকে বাঁচাতে পারেন। তিনি রাজবৈদ্য বাসবদত্ত।

বাতাসের মতো বেগে ছুটে সুরপতি সুভদ্রাকে কোলে নিয়ে এসে পৌঁছল রাজবৈদ্য বাসবদত্তের বাসভবনে। সেখানে তখন লোকে লোকারণ্য। সকলের চোখেই কাতর অশ্রু।

তবে কি বাসবদত্ত আর বেঁচে নেই? সুরপতির সব আশা শেষ?

কিছু লোককে প্রশ্ন করে সুরপতি জানল, বাসবদত্ত এখন একেবারে উত্থান-শক্তিরহিত। তিনি খুব মৃদুকণ্ঠে শ্রীবিষ্ণু নাম করছেন। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, তার আয়ু আর কয়েক দণ্ড মাত্র। সকলেই শোকের সেই চরম মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছে।

সুরপতি কাতর ভাবে বলে উঠল, আমাকে যেতে দাও! তোমরা আমাকে একবার যেতে দাও!

জনতা সরে গিয়ে পথ করে দিল। সুরপতি সুভদ্রাকে কোলে নিয়ে উঠে এল বাসবদত্তের বাসভবনের দ্বি-তলে। মাঝখানে প্রধান কক্ষটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন বাসবদত্ত। তাকে ঘিরে নতমুখে বসে আছে তার পরিচারিকাবৃন্দ। সুরপতিকে দেখে সবাই চমকে তাকাল।

সুরপতির সারা শরীরে রক্ত, তার বক্ষে বিদ্যুৎলেখার মতো এক নারী। যেন স্বয়ং মহাদেব সতীকে বক্ষে নিয়ে উন্মাদের মতো উপস্থিত হয়েছেন সেখানে। কেউ কোনও কথা বলার সাহস পেল না।

সুরপতি আস্তে আস্তে সুভদ্রার দেহ নামিয়ে রাখল মাটিতে। তারপর বাসবদত্তের শিয়রে এসে দাঁড়াল। বাসবদত্তের ঠোঁট একটু একটু নড়ছে। মুখে প্রশান্ত হাসি।

সুরপতি বাসবদত্তের কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকল, প্রভু! প্রভু! আমি একবার আপনার শরণ নিতে এসেছিলাম। তখন আপনার কৃপা গ্রহণ করার সুযোগ পাইনি। তাই আমি এখন এসেছি।

বাসবদত্ত চোখ মেলে বললেন, কে?

সুরপতি বলল, আমি একজন সামান্য মানুষ। কিন্তু ওই দেখুন, ভূমিতে পড়ে আছে এক অসামান্য নারী। ও বিষ খেয়েছে। একমাত্র আপনার কৃপাতেই ও বাঁচতে পারে।

বাসবদত্ত চোখ মেলে বললেন, আমাকে তুলে ধরো।

সুরপতি বাসবদত্তের মাথাটা উঁচু করে তুলে ধরতে তিনি তাকালেন সুভদ্রার দিকে। তার চক্ষু করুণায় আর্দ্র হয়ে উঠল। তিনি বললেন, আহা, এমন চন্দ্রলেখার মতো রূপ, এ কেন অকালে প্রাণত্যাগ করবে। কিন্তু মুখ, আর একটু আগে আসতে পারোনি? আমার যে সময় ফুরিয়ে এসেছে।

প্রভু আপনি তবুকিছু নিদান বলে দিন।

শুধু নিদানে হয় না। আমার স্পর্শ করা চাই। আমি এ পর্যন্ত যতগুলি মানুষকে বাঁচিয়েছি, তার বদলে নিজে একটু একটু করে মরেছি। আমার আর যেটুকু প্রাণশক্তি আছে, তাতে কী আর একটা প্রাণ বাঁচবে! তবু নিয়ে এসো, ওকে আমার এই শয্যায় নিয়ে এসো।

সুরপতি সুভদ্রাকে তুলে এনে শুইয়ে দিল বাসবদত্তের পাশে। তিনি তিনটি ওষুধের নাম বললেন। পরিচারিকার সঙ্গে সঙ্গে সেই ওষুধগুলো এনে সুভদ্রার মুখে ঢেলে দিল।

বাসবদত্ত নিজের ডান হাতখানা সুভদ্রার কপালে রেখে মৃদুস্বরে বলতে লাগলেন, ওঁ শ্রীবিষ্ণু, ওঁ শ্রীবিষ্ণু...।

কয়েক মুহূর্ত পরে সুভদ্রার চোখের একটা পাতা নড়ে উঠল। পরিচারিকার সঙ্গে সঙ্গে তুমুল স্বরে বলল, জ্ঞান আসছে, জ্ঞান আসছে।

বাসবদত্ত সুভদ্রার কপাল থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে অতি কষ্টে জানলার বাইরের সূর্যদেবকে প্রণাম করলেন। তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি আনন্দে চলে গেলাম!

তার শেষ নিশ্বাস বেরিয়ে গেল, তিনি ঢলে পড়লেন।

আর তখনই জেগে উঠে বসল সুভদ্রা। প্রথমেই সে দেখল সুরপতিকে। সে আবেগ ভরে ডাকল, নাথ?

সুরপতি সুভদ্রাকে ধরে বললেন, আমাকে চিনতে পেবেছ? আমি সুরপতি। তোমার স্বামী।

সুভদ্রা বলল, কেন চিনব না? আমি তো দীর্ঘকাল ধরে আপনারই প্রতীক্ষায় ছিলাম। আমি এক দিনও ধর্মচ্যুতি হইনি। আমি জানতাম, আপনি ঠিক একদিন আসবেন।

সুরপতি বলল, সুভদ্রা।

সুভদ্রা বলল, নাথ! এ আমি কোথায়? আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলুন।

সুরপতি আর দাঁড়াতে পারছে না। তার শরীরের সব শক্তি চলে যাচ্ছে। তার চোখের সামনে একটা অন্ধকার সমুদ্র দুলে উঠল। পালঙ্কের দণ্ড ধরে সে নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করল। এত আনন্দ, এত তীব্র সুখ, হঠাৎ এক শরীরে বুঝি ধারণ করা যায় না। অথচ

এই সময় ঘরের মধ্যে কান্নার কলরোল কেন? এই আনন্দের সময় সবাই কেন শোক করছে?

সুভদ্রা ডাকছে তাকে। সুভদ্রা তার হাত ধবেছে, তবু সুরপতি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। তার সব স্নায়ু অবশ হয়ে গেল, সে জ্ঞান হারিয়ে ঝুপ করে পড়ে গেল ভূমিতে।

৯. সুভদ্রার 'নাথ' ডাক শুনে

সুভদ্রার 'নাথ' ডাক শুনে সুরপতি চোখ মেলে তাকাল। ঘনঘোর অন্ধকার। এ কী, সে কোথায়? কিছুই তো সে দেখতে পাচ্ছে না!

সে ডাকল, সুভদ্রা? আমি –আমরা এ কোথায়?

সুভদ্রা বলল, অরণ্যে।

অরণ্যে? অরণ্য কেন? সু

ভদ্রা বলল, অরণ্যই তো আমাদের আশ্রয়।

সুরপতি কিছুই বুঝতে পারল না। সে অনুভব করল, সে সুভদ্রার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে। কিন্তু অরণ্যে কেন? সে তো ছিল বাসবদত্তের কক্ষে।

সে ধড়মড় করে উঠে বসল।

সুভদ্রা বলল, উঠবেন না। আপনি শুয়ে থাকুন আর একটু। রাত পোহাতে আর দেরি নেই।

সুরপতি জিজ্ঞেস করল, সুভদ্রা, এ কোন অরণ্য? এখানে আমরা এলাম কোথা থেকে?

সুভদ্রা বলল, এ তো বল্লারপুরের অরণ্য।

দস্যু বুধনাথের দল আমাদের সর্বনাশ করে গেছে। আপনার মনে নেই?

সুরপতি বিস্মিত ভাবে বলল, বুধনাথ? সে আবার সর্বনাশ করবে কী করে? বুধনাথ তো মরে গেছে। আমিই তাকে নদীতে ডুবিয়ে মেরেছি!

আপনি বুধনাথকে কী করে মারকেন? সে মহাপরাক্রমশালী। আবার যে-কোনও সময়ে সে এখানে আসতে পারে। আমি সারাক্ষণ দেবতাদের পায়ে মাথা খুঁড়েছি। আপনার জ্ঞান না ফিরলে যে কোনও সময় আবার বিপদ ঘটতে পারে। আপনার জ্ঞান ফিরেছে, কাল ভোরেই আমরা এ স্থান ত্যাগ করে চলে যাব।

কী, বুধনাথ মরেনি? সে কি সেই প্রবল নদীর স্রোত থেকেও আবার বেঁচে উঠেছে? ঠিক আছে, আসুক সে। আমি আর তাকে ভয় পাই না। তার এখন একটি মাত্র চক্ষু, তার এক চক্ষু নেই, সে আজ আমার সঙ্গে লড়াইয়ে পারবে না।

নাথ, আপনি আর একটু শুয়ে থাকুন। আপনার স্নায়ু দুর্বল।

না, আমি এখন ঠিক আছি। কিন্তু এই অরণ্যে কী করে এলাম তা তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না। সুভদ্রা, একটু আলো জ্বালতে পারো? আমি দেখতে পাচ্ছি না কিছুই।

কেন, এই তো বেশ চন্দ্রালোক রয়েছে। সব কিছুই তো দেখা যায় এর মধ্যে!

আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

আপনি আর একটু সুস্থ হয়ে নিন। আপনি ঘুমোন, আমি আপনার কপালে হাত বুলিয়ে দিই।

সুরপতি আবার ঘুমিয়ে পড়ল। সত্যিই তার স্নায়ু দুর্বল।

ভোর হতে সুরপতির যখন ঘুম ভাঙল, তখন সে আরও বিমূঢ় হয়ে গেল।

সে শুয়ে আছে এক বনের মধ্যে। পাশেই ঘুমন্ত ধ্রুবকুমার। তার বয়স অনেক কম, তিন-চার বছর মাত্র। ধ্রুবকুমারের বয়স এ-ভাবে কমে গেল কী করে?

সুভদ্রা একটা বৃক্ষে হেলান দিয়ে বসে আছে, তার ক্রোড়ে সুরপতির মাথা।

সুরপতি উঠে বসে সুভদ্রাকে জাগিয়ে তুলে জিজ্ঞেস করল, আমার কী হয়েছিল? আমরা এখানে কেন?

সুভদ্রা বলল, আপনার মস্তিষ্কে চোট লেগেছিল। আপনার দীর্ঘদিন সংজ্ঞা ছিল না।

তোমার আর একটি সন্তান কোথায় সুভদ্রা? ধ্রুবকুমারের কনিষ্ঠ ভাই?

এ আপনি কী বলছেন? আমাদের তো একটিই সন্তান!

বুধনাথ তোমার সর্বনাশ করেনি? আমি নিজের চোখে দেখেছি।

হ্যাঁ, করেছিল। তারপর আমি স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করব ভেবেছিলাম। শুধু আপনার আর ধ্রুবকুমারের কথা চিন্তা করে আমি নিরস্ত থেকেছি। এখন আপনার চেতনা ফিরেছে, এখন আপনিই ধ্রুবকুমারের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবেন। এবার আমি প্রাণত্যাগ করতে পারি।

সুরপতি ব্যাকুল ভাবে বলল, না না, সুভদ্রা, সে-কথা চিন্তাও কোরো না। তুমি অশেষ পুণ্যবতী। সামান্য একটা পশুর স্পর্শে তোমার ধর্মনাশ হতে পারে না কখনও। তাছাড়া তুমি চিন্তা কোরো না, বুধনাথকে আমি শাস্তি দিয়েছি।

সুভদ্রা চুপ করে রইল।

সুরপতি আবার জিজ্ঞেস করল, আমরা কত দিন ধরে এখানে আছি?

সুভদ্রা বলল, জানি না। দিন পনেরো-ষোলো। হিসাব রক্ষা করার তো কোনও উপায় ছিল না। তবে অনুমানে মনে হয় এক পক্ষকাল তো হবেই। বুধনাথ যে-দিন আমাদের সর্বনাশ করে গেল, সে-দিন আপনার মাথায় খুব চোট লেগেছিল, তারপর থেকে আপনার আর সংজ্ঞা ফেরেনি।

কী বলছ এসব কথা, আমরা দারুকেশ্বরে যাইনি?

দারুকেশ্বর কোথায়?

তুমি দারুকেশ্বর চেনো না? তুমি বলভদ্র নামে কারুকে চেনো না?

নাথ, আপনি আর একটু বিশ্রাম নিন। আপনার মস্তিষ্ক এখনও দুর্বল।

সুভদ্রা, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে আমি কি সবই স্বপ্নে দেখলাম? এ কি কখনও স্বপ্ন হয়? একটা কথা বলো তো, এখানে এক পক্ষকাল যে আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে রইলাম, তখন তোমরা কী করলে?

সুভদ্রা বলল, সেই কালরজনী প্রভাত হওয়ায় আমি প্রথমে দেখলাম আমার চারপাশে শুধু কতকগুলি মৃতদেহ। আপনিও নেই ধ্রুবকুমারও নেই। আমার তখন আর বাঁচাব ইচ্ছা ছিল না, তবু আমি আপনাদের সন্ধানে বেরুলাম। শেষ পর্যন্ত এক প্রান্তরে পেলাম আপনাদের, দুজনই অচৈতন্য। ধ্রুবকুমাবের জ্ঞান যদি ফিরল, আপনার আর ফেরেনা। আমি অবলা নারী। তখন আর কী করি! কোনও ক্রমে আপনাকে বয়ে বয়ে নিয়ে এলাম এই ঘোর অরণ্যে। এখানে লোকচক্ষুর আড়ালে রইলাম।

এত দিন তোমরা খেলে কী?

বণিকদের কিছু খাদ্যদ্রব্য সেই লুণ্ঠনের স্থানে ছড়ানো ছিল। আমি তার কিছু কিছু এনেছি। আর আছে বনের ফলমূল।

সুরপতি বলল, কিছুই বুঝি না! কিছুই বিশ্বাস করি না।

সুরপতি নিজের শরীরের দিকে তাকাল। তারপর আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার ডান বাহুতে একটা চৌকো পোড়া ছাপ। সে বলল, এই দেখো, কারাগারে আমার গায়ে এই ছাপ দেওয়া হয়েছিল। যে কারাগার থেকে আমি বুধনাথের সঙ্গে পালিয়েছিলাম!

সুভদ্রা বলল, লুণ্ঠনের দিনে আপনার হাতের ওই জায়গায় ছ্যাঁকা লেগেছিল।

না না, তা হতেই পারে না। তুমি শপথ করে বললো, আমরা এখান থেকে আর কোথাও যাইনি? তুমি দারুকেশ্বরে সরাইখানায় ছিলে না?

দারুকেশ্বর কোথায়?

চলো চলো, এক্ষুনি চলো।

কিন্তু কয়েক পা গিয়েই সুরপতি আবার মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। আবার তার জ্ঞান ফিরল একটু পরেই।

সে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। তার মন কিছুতেই শান্ত হয় না। এ কখনও স্বপ্ন হতে পারে? স্বপ্নের মধ্যে মানুষ এত কষ্ট পায়?

সে সুভদ্রাকে বলল, সুভদ্রা, সুভদ্রা। মাঝে মাঝে আমি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলছি। এক-একবার তোমাদের দেখছি, আবার সব অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।

সুভদ্রা বলল, আপনি আমার হাত ধরুন। আমি আপনাকে শক্ত করে ধরে থাকব।

বালক ধ্রুবকুমার, সে-ও এসে সুরপতির অন্য হাত ধরে বলল, বাবা, আমিও তোমার হাত ধরব।

স্ত্রী ও পুত্রকে দু'পাশে নিয়ে হাঁটতে লাগল সুরপতি। মাঝে মাঝেই তার চোখ অন্ধকার হয়ে আসে, তখন সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। একটু পরেই আবার উঠে দাঁড়ায়, আবার চলে।

খানিক দূর এসে একটা গোচক্রযান মিলল। তাতেই উঠে বসল ওরা। গাড়িটি দারুকেশ্বর যাবে। তার আগে আর তেমন কোনও বড় শহরগঞ্জ নেই। তবু এর মধ্যে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম পড়ল, সে-গ্রাম সুরপতির চেনা। সুরপতি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল শুধু মুখে কিছুই বলল না।

সারা দিন ধরে চলার পর সন্ধ্যার সময় তাদের একটি অরণ্য পার হতে হল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, শীঘ্রই বুঝি বৃষ্টি নামবে।

অরণ্যটি পার হবার পর আবার কিছু দূরে গিয়ে পথের পাশে একটি সাদা রঙের দ্বি-তল গৃহ চোখে পড়ল। ধক্ করে উঠল সুরপতির বুক। এই তো সেই গৃহ! প্রবল বৃষ্টির মধ্যে সুরপতি এসে আশ্রয় নিয়েছিল এখানে। হঠাৎ সেই গৃহের ভেতর থেকে ভেসে এল ব্যাঘ্রের হুঙ্কার।

সুরপতির সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। সে শকট চালককে বলল, শীঘ্র চলো, শীঘ্র এ জায়গাটা পার হয়ে যাও!

শকটচালক বলল, ভয় পাবেন না। এই কুঠিতে একটি ব্যাঘ্র আছে আমি জানি, কিন্তু সে কখনও বাইরে আসে না।

সুরপতি মুখ ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, আর কে কে আছে এই গৃহে?

শকটচালক বলল, দুই সুন্দরী মুসলমান রমণী। তাদের এক জনের গলার গান কোকিলকে হার মানায়। আর এক জনের মাথার ঠিক নেই।

সুরপতি নিজের মাথা চেপে ধরে বেদনা দমন করে সুভদ্রাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি আমাকে মিথ্যা কথা বলছ কেন? কেন বলেছ যে আমরা ওই অরণ্য ছেড়ে কোথাও যাইনি?

সুভদ্রা বলল, কোথাও যাইনি, এটাই তো সত্য। দস্যুর হাত থেকে আমাকে বাঁচাবার জন্য আপনি এসেছিলেন, এক জন আপনার মাথায় ডাণ্ডা মারে, আপনি অজ্ঞান হয়ে যান। আর জ্ঞান ফেরেনি।

অনেক রাত্রে গোযানটি এসে পৌঁছল দারুকেশ্বরে। নগরে প্রবেশের মুখে সেই প্রথম সরাইখানাটি। একনজর মাত্র তাকিয়েই সুরপতি চিনতে পারল। সে সুভদ্রাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি এই সরাইখানাটি চেনো না?

সুভদ্রা অবাক মুখে উত্তর দিল, আমি তো এখানে কখনও আসিনি।

তবে আমি এলাম কী করে?

সুভদ্রা নীরব।

সুরপতি চিৎকার করে ধ্রুবকুমারকে জিজ্ঞেস করল, ধ্রুব, তুমি এখনে কখনও থাকোনি?

বালক ধ্রুবকুমার কিছুই বুঝতে পারল না।

সরাইখানার সামনে সেই পরিচিত মাংসের দোকানটি ঠিকই আছে। সেই পরিচিত কশাই সেখানে বসে আছে। এবং সরাইখানার মালিক যখন বেরিয়ে এল, তখন দেখা গেল সে আর কেউ নয়, সেই বলভদ্র।

সুরপতি তাকে জিজ্ঞেস করল, কী বন্ধু, চিনতে পারো?

বলভদ্র সামনে এগিয়ে এসে ভাল করে সুরপতিরমুখ নিরীক্ষণ করে বলল, কে আপনি? বংশীলাল?

সুরপতি বলল, ফের বংশীলালের কথা? সেসব তো মিটে গেছে। আমি সুরপতি।

বলভদ্র অপ্রসন্ন ভাবে বলল, আপনি বংশীলাল হন বা যে-ই হন, আমার এখানে স্থান নেই।

এই সময় বালক ধ্রুবকুমার বলল, বাবা, আমার খিদে পেয়েছে, আমার ঘুম পেয়েছে।

সুরপতি আবার চক্ষে অন্ধকার দেখল। আবার সে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল সরাইখানার চত্বরে।

জ্ঞান ফিরে দেখল, সরাইখানারই একতলার একটি ছোট ঘরে সে শুয়ে আছে। পাশে সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমার। অনেক দিন পর তারা নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে।

তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। সুরপতি বাইরে এসে দাঁড়াল। তার মন এক বিষণ্ণ অবসাদে ভরে আছে। এর আগে যা যা ঘটেছিল, তা সবই কি স্বপ্ন? তাহলে এই বলভদ্রের সরাইখানা সে চিনল কী করে? স্বপ্নে এমন অপরিচিত সব স্থান ও মানুষজন কি হুবহু দেখা যায়? তবে কি স্বপ্নে যে যে ঘটনা ঘটেছিল, সেগুলো এবার তার জীবনে ঘটবে?

এ-কথা মনে হতেই সুরপতির শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল।

বেলা বাড়ার পর বলভদ্র এসে তাকে বলল, আপনার দেখছি মৃগীরোগ আছে। আপনি চিকিৎসা করান, সেরে যাবে। আমাদের এখানে এক জন খুব ভাল চিকিৎসক আছেন, প্রায় ধন্বন্তরি বলা যায়।

সুরপতি শ্লেসের সঙ্গে বলল, নিশ্চয়ই তার নাম রাজবৈদ্য বাসবদত্ত।

আপনি তাঁর নাম জানেন নাকি? তা জানতেই পারেন, দেশ-বিদেশের নাম ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু তার তো বেঁচে থাকার কথা নয়।

এ কী কথা বলছেন? রাজবৈদ্য বাসবদত্ত যমকে জয় করেছেন, তিনি অমর।

সুরপতি পাগলের মতো হা-হা করে হেসে উঠল। তারপর বল, আচ্ছা দেখাই যাক না। আমি যাব সেখানে।

সুভদ্রাকে কিছু না বলেই বেরিয়ে পড়ল সুরপতি। পথতার চেনা। বাসবদত্তের গৃহ খুঁজে বার করা তার পক্ষে কিছুই নয়। কিন্তু কিছুটা এসেই সুরপতি থমকে দাঁড়াল। তার কোমরের কাছে তার টাকার পুঁটুলিটা রয়েছে। সুভদ্রার কাছে আর কিছুই নেই। যদি সে আর না ফেরে কোনও কারণে, তাহলে সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমার সেই রকম অসহায় অবস্থায় পড়বে।

না, এ-রকম ভুল সে আর দ্বিতীয় বার করবে না। সুরপতি আবার ফিরে এল। ঘরে এসে দেখল সুভদ্রা মাথায় দীর্ঘ অগুণ্ঠন টেনে বসে আছে। ধ্রুবকুমার খেলা করছে একটা ভাঙা মৃৎ-শকট নিয়ে।

সুরপতি ধ্রুবকুমারকে ঝট করে কোলে তুলে নিয়ে সুভদ্রাকে বলল, চলো আমার সঙ্গে।

কোথায়?

রাজবৈদ্যের কাছে। আমি যে মাঝে মাঝে চোখে অন্ধকার দেখি তা সারিয়ে তুলতে হবে। নইলে আমি নতুন কাজকর্ম শুরু করব কীভাবে।

চলুন।

তুমি সবসময় আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে তুমি চিকিৎসক ডাকবার জন্যও কোথাও যেও না। মনে রেখো তুমি অন্য কোথাও গেলেই বিপদ হতে পারে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা এসে পৌঁছল রাজবৈদ্য বাসবদত্তের প্রাসাদের সামনে, সেখানে অসংখ্য মানুষ। ঘরের ভেতর ভরতি করে, বাইরেও বহু মানুষ অপেক্ষা করছে।

সুরপতি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, বাসবদত্ত কি বেঁচে আছেন?

অমনি কয়েক জন লোক হা-হা করে উঠল। তারা সুরপতিকে ধমক দিয়ে বলল, তুমি তো আচ্ছা বেকুব হে! মহাপ্রাণ বাসবদত্তসম্পর্কে এমন কুকথা উচ্চারণ করতে আছে? তিনি বেঁচে থাকবেন না কেন?

সুরপতি বুঝতে পারুল, তার ভুলই হয়েছে। প্রথম দৃশ্যে বাসবদত্ত তো বেঁচেই ছিলেন।

সুরপতি বলল, তিনি কখন নিচে নামবেন?

এক জন বলল, তিনি আগে যাবেন রাজার কাছে। রাজা লোক পাঠিয়েছেন, তাঁর শরীর অসুস্থ।

সুরপতি হাসল। সে খুব নিচু গলায় বলল, জানতাম। আমি সবই জানি।

ঘরের মধ্যে বেশ গরম। বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, তাই সুরপতি স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে বাইরে এল। সামনে একটি সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রান্তর। সেদিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। অদূরে রয়েছে একটি নদী।

একটুখানি ভ্রমণের জন্য সুরপতি সবেমাত্র সেই প্রান্তরের মধ্যে এগিয়েছে, এমন সময় দেখল চার জন রাজপুরুষ তার দিকে আসছে। তারা সবাই সশস্ত্র।

তারা সুরপতির সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রশ্ন করল, কে? বংশীলাল না?

সুরপতি আঁতকে উঠল। এরপর কী হবে, তা-ও সে জানে। সে যে অতি সাংঘাতিক!

সে দু'হাতে মুখ ঢেকে উন্মাদের মত চিৎকার করতে লাগল, না, আমি বংশীলাল নয়, সব মিথ্যে, সব মিথ্যে–সুভদ্রা, আমাকে বাঁচাও।

সুরপতির যখন আবার জ্ঞান ফিরল, তখন দেখল তার চারপাশে একটা বিরাট জনতা হয়ে গেছে। সে প্রথমেই সুভদ্রাকে খুঁজল। সুভদ্রা তার পাশেই দাঁড়িয়ে তার একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে আছে।

সে কান্না-মেশানো গলায় বলল, আমি বংশীলাল নয়, এই আমার স্ত্রী-পুত্র, এরা সাক্ষী আছে।

জনতার মধ্য থেকে কয়েক জন বলল, মহাশয়, আপনার ভয় নেই, রাজপুরুষেরা তাদের ভুল স্বীকার করেছেন। আপনি তো মুক্তই আছেন।

সুরপতি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সুভদ্রা চলল, আমরা এক্ষুনি এ-দেশ থেকে চলে যাই। দারুকেশর বড় সাংঘাতিক স্থান, অন্তত আমাদের পক্ষে। এখানে বংশীলাল আছে। তার জন্য আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

অবিলম্বে একটি অশ্বশকট ডাকা হল। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে তাতে উঠে বসে সুরপতি বলল, আমরা আবার তাম্রলিপ্তেই ফিরে যাব। সেখানে আমার পূর্বপুরুষের বাস। সে আমার নিজের স্থান। যদি মরি তো সেখানেই মরব। এ-দেশে আর নয়।

স্ত্রী ও পুত্রের হাত শক্ত করে ধরে রইল সুরপতি। এই তার ছোট্ট সংসার। এদের নিয়েই তার পৃথিবী। সে আর এদের ছাড়বে না।

শকট ছুটে চলল তাম্রলিপ্তের দিকে।